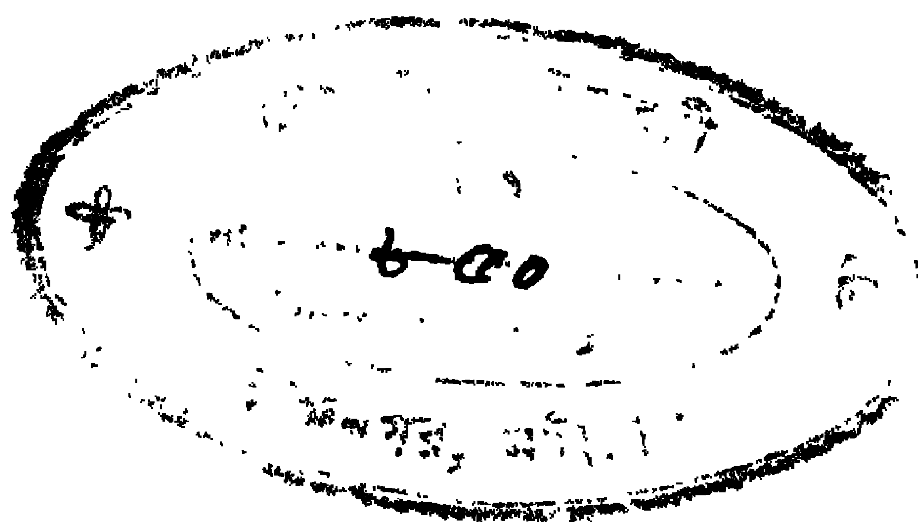
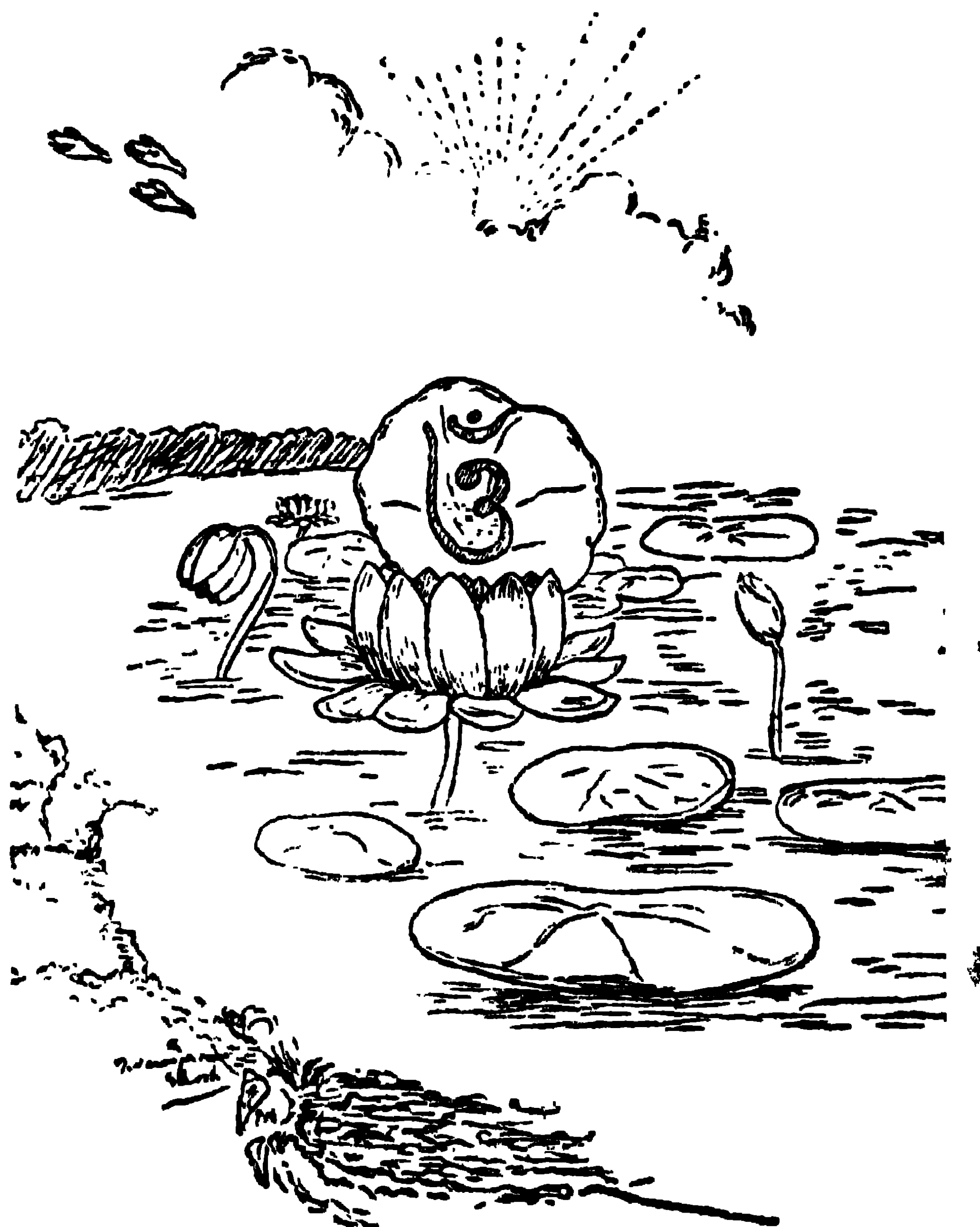




৮০০

চিঠি ২য় খণ্ড

জন্মমৃত্যু



শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত সঙ্কলিত

প্রকাশকমণ্ডলীর অনুমত্যানুসারে—
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ;
২৫।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
১৩৩৬

প্রাপ্তিস্থান—প্রকাশকের নিকট ও
ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং, ৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট।

শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ব্রাহ্মমিশন-প্রেস
২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

"জন্মমৃত্যু" সম্বন্ধে বা শোকার্ত্তকে সান্ত্বনাস্বরূপ সন্ন্যাসী-দাদার লিখিত পত্রগুলি এবং তাঁহার নানাশ্রেণীর এমন সব পত্র পাওয়া গিয়াছে, যেগুলিকে ব্যক্তিগত বলা যায় না; উহা সকলের পক্ষেই শান্তিপ্রদ। ব্যক্তিগত চিঠিগুলি যে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে তাহার প্রচার ' বন্ধুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলেও এগুলির সম্বন্ধে সেরূপ করা হইবে না, প্রকাশক-মণ্ডলী এই অভিপ্রায় জানাইয়াছেন।

'চিঠি'র এই খণ্ডের সম্পাদনকার্য্যেও পূর্ব্ববৎ পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের অমূল্য সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা প্রথম খণ্ড পাইয়াছেন তাঁহারা জানেন, কি ভাবে কাহার যত্নে আগ্রায় এই পত্রগুলি সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়াছিল। তাই এগুলির গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্ব্বে সেই পূজনীয়া মাতৃদেবীকে ভক্তিভরে স্মরণ করি।

যাঁহারা জন্মমৃত্যুর চিরন্তন দোলায় দুলিতেছেন, সেই অমৃতের সন্তানগণের উদ্দেশেই এই গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত হইল।

রাখী পূর্ণিমা, ১৩৩৬
৩১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

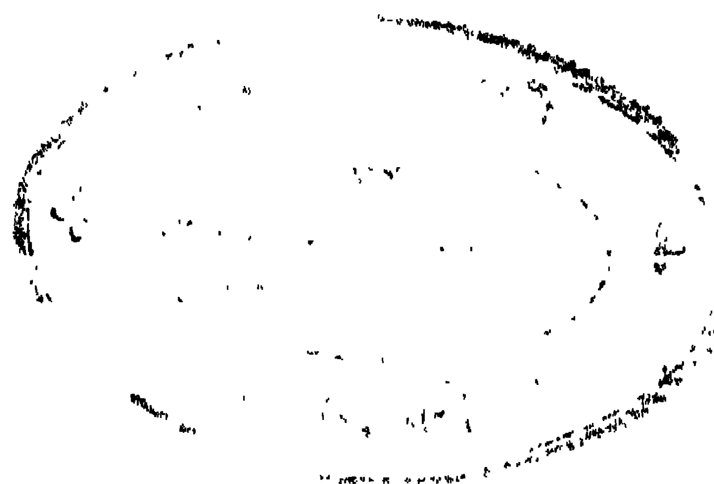
বিনীত
শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১০	চিত্তকে	চিত্তের
৫৩	২১	স্পৃষ্টিতে	দৃষ্টিতে
৮১	২	সিদ্ধদেহের	সিদ্ধদের
১০৬	২০	অন্নাপতে	অনুপাতে
১৮৩	৬	আমার দেহ নাই	আমি দেহ নই
২০৪	১৭	ভাবনা	কথা

Presented to D. B. Library
By
S. S. Kar.
5. 1. 1931

জন্মমৃত্যু



ওঁ

সমুদ্রের দুইটী অবস্থা, একটি শান্ত একটি তরঙ্গায়িত। ব্রহ্মের দুইটী ভাব, একটী নির্গুণ আর একটি সগুণ। শান্ত জল যে কোন কারণেই হউক তরঙ্গায়িত হইয়া আপন বক্ষে আপনি উঠিয়া নাচিয়া লীলা করিয়া লয়প্রাপ্ত হয়, অথবা তরঙ্গগুলি নাচিয়া খেলিয়া লীলা করিয়া আপন বক্ষে আপনি ঘুমাইয়া পড়ে।

জন্মমৃত্যু

যে একবার জলের উভয় অবস্থাই ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছে, সে যে উভয়কেই একের অবস্থা একেরই সগুণ-নির্গুণ ভাব মনে করিয়া সব ভাবেই সমানভাবে আনন্দ-ভোগ করে। এই উঠানামা, দিনরাত, খেলা-বিশ্রাম, গড়াভাঙ্গা, জন্মমৃত্যু সবই যেন একতালে অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। এই উঠানামা নিয়া জল কারণ-বারি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ভিতর দিয়া সৎএর মহিমা ঘোষণা

করিতেছে। দিন-রাত্রির মধ্য দিয়া মহাকাল ভূত-ভবিষ্যতের ভিতর দিয়া অনন্তকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, এই খেলা ও বিশ্রামের কর্ম্ম-অকর্ম্মের ভিতর দিয়া কর্ম্ম ও প্রেমের তত্ত্ব, সেবা ও সমাধি-তত্ত্ব আস্বাদ করে। এই গড়া ও ভাঙ্গার মধ্য দিয়া দেবী মহামায়া সেই অবিকৃত শিবতত্ত্বকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া আমরা আমাদের আত্মার নিত্য তত্ত্ব আস্বাদ করিবার সুযোগ পাই। নির্গুণের সগুণ ভাবে প্রকাশ পাইবার জন্য, স্বয়ংপ্রকাশের আপন তত্ত্ব প্রকাশের জন্য, রসস্বরূপের আপনাকে আস্বাদ্য করিয়া তুলিবার জন্য এই দ্বন্দ্বভাবের মধ্য দিয়া জীবকে দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় লইয়া গিয়া পরমতত্ত্ব আস্বাদ করাইতে হয়। দিনের বেলা কাজের বেলা সৃষ্টির বেলা আলোর বেলা আমরা জন্মের ভিতর দিয়া মায়েরই আদেশে মাকে একটু ভাল করিয়া জানিবার জন্য বুঝিবার জন্য পাইবার জন্য আস্বাদ করিবার জন্য মা হইতে যেন একটু দূরে গিয়া পড়ি; রাত্রির বেলা বিশ্রামের বেলা লয়ের বেলা আমরা আবার আমাদের সব কল্পিত খেলাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মৃত্যুর ভিতর দিয়া গিয়া মায়ের অভয় কোলে ঘুমাইয়া পড়ি। দিনটা সৃষ্টিটা জন্মটা খেলাটা মার কোল হইতে একটু দূরে গিয়া একটু কাজ করিবার লীলা করিবার সময়; রাত্রিটা লয়টা মৃত্যুটা আবার মায়ের কাছে

ছুটিয়া গিয়া মায়ের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া মায়ের সহিত চরম মিলন পরম প্রেম আস্বাদ করিবার সময়। জন্মটা খেলাটা দিনটা বিরহাত্মক, মৃত্যুটা শান্ত ভাবটা রাতটা সম্ভোগাত্মক। জন্ম দ্বারা আমরা বাহিরে বিষয়ের দিকে ছুটিয়া যাই, মৃত্যুর দ্বারা আমরা ভিতরে মায়ের খাস মহলে গিয়া মিলনানন্দ অনুভব করি। যে অসাধক যে বহির্মুখ, সে এই অসার বিষয়রসে বিমোহিত হইয়া মায়ের কথা প্রেমের কথা মিলনের কথা আনন্দের কথা আনন্দধামের কথা ভুলিয়া যায়, বিদেশকে স্বদেশ মনে করিয়া জেলখানাকে প্রকৃত বাসস্থান মনে করিয়া কতকগুলি তামসিক আনন্দ লইয়া ভুলিয়া থাকে; আর যে সাধক সে অন্তর্মুখী হইয়া মায়ের ডাক শুনিয়া মায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া বিষয়ের অলীক সুখবন্ধন ছিন্ন করিয়া মায়ের সহিত মিলনানন্দ উপভোগের জন্য মায়ের আনন্দধামে যাইবার জন্য বিদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে গিয়া প্রকৃত স্বদেশী স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। সংসার সৃষ্টি বিরহ জন্মলীলা সে যেন আর সহ্য করিতে পারে না! সে তখন মৃত্যুর ভিতর দিয়া গিয়া অমৃতত্বলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, একবার মায়ের কাছে গিয়া মায়ের অভয় কোলে চরম গতি পরম প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করে। এইজন্য সাধকগণ রাত্রিকে লয়কে বিশ্রামকে মৃত্যুকে প্রেমকে এত ভালবাসেন।

তাঁহাদের সাধনার ক্ষেত্র উপলব্ধির ভূমি মহাশ্মশান, উপায় চিত্তবৃত্তিনিরোধ, কামনা-বাসনা-সংস্কার আসক্তির লয়সাধন, আরাধ্য দেবতা শ্মশানবাসিনী প্রলয়ঙ্করী মা মহাকালী, লক্ষ্য শিবত্বলাভ, শূন্যত্বের ভিতর দিয়া পূর্ণত্বে পরিণত হওয়া। এইজন্য প্রকৃত সাধক শ্মশানকে রুদ্রকে মৃত্যুকে মহাকালকে এত ভালবাসেন। রুদ্র না হইলে মা ভৈরবী না হইলে সাধকের চিত্তের মলিনতা কে দূর করিবে? মা যে শাসনের ভিতর দিয়া বিধানের ভিতর দিয়া মুক্তির প্রশস্ত পথ 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং' পথটী দেখাইয়া দেন। তারপরে সিদ্ধাবস্থায় সগুণ-নির্গুণ সাকার-নিরাকার সক্রিয়-অক্রিয় লীলা-স্বরূপ জন্ম-মৃত্যু বিরহ-মিলন জাগ্রৎ-সুষুপ্তি আদি দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া একই তত্ত্ব আস্বাদ করিয়া আমরা স্বরূপে আসিয়া লীলা করিতে লীলার ভিতর দিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে এত ভালবাসি।

সিদ্ধাবস্থা উদাসীন অবস্থা গুণাতীত মুক্ত অবস্থা আমাদের জীবনের লক্ষ্য হইলেও সাধন অবস্থায় থাকা পর্য্যন্ত আমরা ইহা ঠিকভাবে ধারণা করিতে পারি না। আমাদের অনেকেই যে ভগবানকে ভুলিয়া স্বরূপ ভুলিয়া একান্তভাবে বহির্মুখ হইয়া একটা ঘোর তামসিক বিষয়রসে একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছি, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং আমাদের কল্যাণের জন্য আমাদিগকে মা আনন্দময়ী সাধক

করিয়া তুলিতে চান। একবার এই জন্মমৃত্যুর পরপারে লইয়া গিয়া সাজঘরে লইয়া গিয়া মায়ের স্বরূপ আমাদের স্বরূপ মায়ের সৃষ্টিতত্ত্ব জন্মমৃত্যু-রহস্য আস্বাদ করাইতে চান। আমরা রহিয়াছি ঘোর তমোগুণে সংসারের এপারে, আমাদের মা রহিয়াছেন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে সংসারের অপর পারে; উভয়ের মাঝখানে রহিয়াছে রজোগুণের মস্ত একটা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়তত্ত্ব—একটা বিরহের মহাসিন্ধু, মস্ত একটা কামনা-বাসনা সংস্কাররূপী সংসারসাগর! এই কল্পিত বিরহসাগর উত্তীর্ণ না হইলে কাহারও যে আর মার আনন্দধামে যাইবার উপায় নাই। সাধক মাতৃভক্ত সংসারের অসারতা অবগত হইয়া আনন্দধামের আনন্দবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যখন সংযম-সাধনের ভিতর দিয়া চিত্তবৃত্তি লয় করিয়া পরম বৈরাগ্যের সাহায্যে একটু মায়ের দিকে ফিরিয়া চান, তখনই মায়ের সেই দিব্যধামে নীরব সুরের মধুর বাণী মায়ের স্নেহাপ্লুত মধুর আহ্বান শুনিতে পাইয়া মাতৃপ্রেম স্মরণ করিয়া কি ভাবে মৃত্যুর পরপারে মায়ের অমৃতধামে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন, সাধক কবি তাঁহার অমর সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সে ভাবটা কতকটা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন :—

"ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে কাতর প্রাণে
আয় চলে আয়, ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে।

(বলে) আয়রে ছুটে আয়রে ত্বরা,
হেথায় নাইকো মৃত্যু নাইকো জরা,
হেথা বাতাস গীতিগন্ধে ভরা, চিরস্নিগ্ধ মধুমাসে ;
হেথা চিরশ্যামল বসুন্ধরা চির-জ্যোৎস্না নীলাকাশে।
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে ;
(ঐ দেখ) সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে।
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে
আয় চলে আয় আমার পাশে।
কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ, ওরে ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ !
ভবে সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে প'ড়ে আছিস পরবাসে।"

সাধক প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে পারেন, কিভাবে তাঁহার প্রাণের দেবতা মৃত্যুর পরপারে ভুবনমোহনরূপে দাঁড়াইয়া তাঁহার শব্দব্রহ্মময় বেণুরবের ভিতর দিয়া ত্রিতাপ-তাপিত তাঁহার প্রিয় জীবগণকে আপন আনন্দধামে লইয়া গিয়া সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর করিয়া পরমানন্দ লাভের অধিকারী করিয়া তুলিবার জন্য সর্ব্বদা আহ্বান করিতেছেন। ব্রজধামে একদিন তাঁহার প্রাণের রাধারাণীকে এই ডাক এই অভিসারের আহ্বান একান্তভাবে বিমোহিত করিয়াছিল। একবার সে ডাক কানে গেলে যে তাঁহার কাছে না

গিয়া কোনমতে স্থির থাকা যায় না। কবি বলেন, পতঙ্গ এই ডাকে মোহিত হইয়াই নাকি জ্বলন্ত আগুনে লাফাইয়া পড়িয়া মৃত্যুর ভিতর দিয়া প্রেমধামে চলিয়া যায়। প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ সামের ছন্দতত্ত্বের ভিতর দিয়া এই আহ্বান-রহস্যই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই আহ্বান তাঁহার আনন্দধামে লইয়া যাইবার জন্য, ইহার মধ্যে কোনও জোর নাই উগ্রতা নাই কঠোরতা নাই; ইহা যেন মধুমাখা—তাঁহার কাতর প্রাণের আকুল বেদনা প্রকাশ করিয়া থাকে। জীব ভগবানের কাছে যাইতে যত ব্যস্ত, ভগবান তাঁহার প্রিয়তম জীবগুলিকে তাঁহার আনন্দধামে লইয়া যাইবার জন্য তাহা অপেক্ষা কোটীগুণ অধিক ব্যস্ত। জীবের দুঃখে যে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়! আমরা না'হলে যে বাস্তবিকই তাঁহার চলে না; তিনি যেন আর বিলম্ব সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার সেই স্বর্গধামের অপার্থিব সৌন্দর্য্য অপ্রাকৃত গীতিগন্ধ চিরস্নিগ্ধ বসন্ত জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী ফুল্লকুসুমিত শ্যামল বসুন্ধরার প্রলোভন দেখাইয়া তিনি যে তাঁহার প্রিয়তম জীবকে তাঁহার আনন্দধামে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমরা এই ভূতের জগতে বৃথা ভূতের বোঝা বহন করিয়া মরিব, তাহা তিনি কি করিয়া সহ্য করিবেন? সুধাসিন্ধুর তীরে বসিয়া আমরা বুদ্ধির দোষে হলাহল পান করিয়া

হাহাকার করিব, তিনি তাহা কি করিয়া সহ্য করিবেন? তাঁহার সেই স্বর্গীয় জ্যোতি অপার আনন্দবিভূতি মাধুর্য্য লাবণ্যের নিদানস্বরূপ লীলারহস্য—এ সব যে শুধু আমাদের সুখের জন্যই তিনি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার মুক্ত অজর অমর সন্তানগণ সংসারের কারাগৃহে বন্দী হইয়া বাস করিবে, এমন আলোর দেশ সৌন্দর্য্যের দেশ সম্মুখে থাকিতেও কাল্পনিক তমোগুণে আবৃত হইয়া সুখ শান্তি আরাম লাভে বঞ্চিত থাকিবে, ইহা কি তিনি সহ্য করিতে পারেন? তাই তিনি তাঁহার শব্দস্পর্শাদি সমস্ত তত্ত্বের ভিতর দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে, তিনি সমস্ত সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যের আনন্দের মূল প্রস্রবণ। সাধক ভক্ত তাঁহার এই মধুর আহ্বান শুনিয়া একান্তভাবে বিচলিত হইয়া পড়েন।

অসাধকের নিকট যে মৃত্যু ভয়ানক দুঃখকর, সাধকের নিকট তাহাই পরম আনন্দের নিদানস্বরূপ। অপ্রেমিক যে অন্ধকার দেখিয়া ভয় পায়, প্রেমিক সেই অন্ধকারকে তাঁহার পরম মিলনের উপযুক্ত সাধন জানিয়া তাহার ভিতর দিয়া গিয়া অভয়প্রতিষ্ঠা-লাভে সচেষ্ট হন; সেই আঁধার ভেদ করিয়া প্রেমিকের সূর্য্যকোটীপ্রকাশক চন্দ্র-কোটী সুশীতল প্রেমমুখজ্যোতি ফুটিয়া বাহির হয়। মনে রাখিতে হইবে সাধকের লক্ষ্য সিদ্ধিলাভ সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি, মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইয়া জন্ম-মৃত্যুর খেলা নিয়া

আনন্দে বাস করা ; প্রকৃত অমৃত-তত্ত্ব আস্বাদ করিয়া স্বরূপে বসিয়া লীলাতত্ত্ব আস্বাদ করিতে পূর্ণস্বরূপকে সর্ব্বদা পূর্ণ-ভাবে উপভোগ করিতে তিনি যে বড়ই ভালবাসেন। তাঁহার সংযম উপভোগের জন্য, তাঁহার মদনভস্ম পার্ব্বতীকে বিবাহ করিবার জন্য, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য আদর্শ গৃহী হইবার জন্য, তাঁহার 'নেতি' 'নেতি'-সাধন 'ইতি'কে পূর্ণভাবে পাইবার জন্য, তাঁহার শূন্যবাদ লয়যোগ অদ্বয় পূর্ণতত্ত্বকে পূর্ণভাবে আস্বাদ করিবার জন্য, তাঁহার নিদ্রা জাগরণের লীলার সহায়—লীলারস আস্বাদনের অনুকূল, তাঁহার মৃত্যু জীবনকে অমৃত-ময় করিয়া তুলে, তাঁহার ক্ষমা শক্তিকে প্রকাশ করে, তাঁহার শান্তভাব অনন্ত তেজের পরিচায়ক, তাঁহার বিনয় জ্ঞানকে সৌন্দর্য্য দান করে, তাঁহার গ্রহণ ত্যাগকে মহিমাময় করিয়া তুলে, তাঁহার বিরহ মিলনকে নিত্য নূতন করিয়া জাগাইয়া রাখে, তাঁহার জগৎ সত্যস্বরূপকে প্রচার করে, তাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানকে প্রেমকে মধুর করিয়া সার্থক করিয়া তুলে ; সেবা তাঁহার জাগ্রতের পরম সাধন, মৈত্রী তাঁহার ধ্যানের মধুর অবলম্বন, কৈবল্য তাঁহার প্রেমাস্বাদনের চরম তত্ত্ব ; তিনি ছাড়েন ধরিবার জন্য, ধরেন ছাড়িবার জন্য ; তিনি বাস করেন ত্যাগাদানের ভুক্তি-মুক্তির সংসার-রহস্যের পরপারে। সেদেশে যাইবার রাস্তা মৃত্যুর ভিতর দিয়া ; তাইতো সাধক ভক্ত বৈরাগ্যকে দুঃখকে মৃত্যুকে এতটা আনন্দের

সহিত বরণ করিয়া থাকেন। সাধকের আবেগপূর্ণ সঙ্গীতগুলি তাঁহার প্রাণের ভাবগুলি সাধনরহস্যকে অতি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে :—

"শ্মশান ভাল বাসিস্ বলে, শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচ্‌বি বলে নিরবধি।
আর কিছু সাধ নাই মা চিতে, দিবানিশি জ্বলছে চিতে,
চিতাভস্ম চারিভিতে রেখেছি মা, আসিস্ যদি।
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে ফেলিয়ে চরণতলে,
আয় মা নেচে তালে তালে, দেখি' তোরে নয়ন মুদি' ॥"

চিত্তকে সমস্ত কামনা-বাসনা-সংস্কারকে পূর্ণভাবে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলিতে না পারিলে মাকে যে হৃদয়ে নাচান যায় না, মা যে হৃদয়ে নাচিতেছেন সে তত্ত্ব অনুভব করা যায় না। শিবতত্ত্ব বুঝিতে হইলে নিজেকে নিজের ছোট আমিকে কাঁচা আমিকে একান্তভাবে শবে পরিণত করিতে হয়। সাধক কেন যে তাঁহার হৃদয়কে শ্মশানে পরিণত করিতে এতটা সচেষ্ট, সে তত্ত্ব আস্বাদ করিতে না পারিয়াই তো আমার আদরিণী আনন্দময়ী মাকে অসাধক অজ্ঞানীরা এরূপ ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছে। মায়ের বিধান কোথায় কাহার নিকট কেন ভয়ঙ্কর, এ তত্ত্ব আস্বাদ করিতে পারিলে সাধক যে তখন মায়ের অভয়কোলে আশ্রয় লইয়া মায়ের সৃষ্টিতত্ত্ব লীলারহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবন সার্থক করেন :—

"মা তোর মায়া-বিভূতি কে জানে মা তোমা বিনে ?

জানিলে জানতে পারে সে মাত্র, যে নয় তন্মাত্রাধীনে।"

মায়ের তত্ত্ব বোঝা তত সহজ নয়; মায়ের কৃপা ছাড়া প্রায় অসম্ভব। সাধক ভক্ত কিন্তু মার সঙ্গে একটু রসিকতা করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। তিনি সমস্ত দোষের বোঝা মায়ের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া মায়ের কোলের অতি ছোট ছেলে হইয়া মাকেই সব কাজের জন্য দায়ী করিয়া তুলেন। বলেন—

"আপনার মায়ায় আপনি তুমি যাতায়াত কর বারংবার।

নিজে বোঝনা নিজের মায়া এই তো তোমার মায়ার বিকার॥

সে মায়া দ্বিজ-গোবিন্দ বুঝিবে কেমনে ?"

সাধক রামপ্রসাদও 'যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়াইয়াছি' বলিয়া মায়ের বোঝা মায়ের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্তে বাস করিতে শিখিয়াছিলেন। বাস্তবিকই ভগবান নিজেও হয় তো ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না যে, কেন তিনি সৃষ্টি ও লয় নিয়া, জন্মমৃত্যু-রহস্যের ভিতর দিয়া এই বিচিত্র খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শিব-ভক্ত শঙ্কর মায়ের এই খেলাটিকে শুধু একটা বিবর্ত্তবাদে পর্য্যবসিত করিয়া জন্মমৃত্যুর হাত হইতে শিবকে রক্ষা করিতে কতকটা প্রয়াস পাইয়াছেন। সাধকবিশেষ আনন্দ-প্রাচুর্য্য হইতে জন্মমৃত্যু-রহস্য আবিষ্কার করিতে গিয়া

সৃষ্টিকর্ত্তার আনন্দময়ত্ব বজায় রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। শঙ্কর কিন্তু তাহার ভিতরেও একটু ভাবনার কারণ অনুমান করিয়া, সৃষ্টি-রহস্যটাকে জন্মমৃত্যু-খেলাকে একটা রজ্জু-সর্পবৎ বিবর্ত্তনবিশেষ বলিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। বাস্তবিকই জন্মমৃত্যু-লীলা সাধকের নিকট লীলাখেলা হইলেও অসাধকের নিকট একটা প্রকাণ্ড হৃদয়বিদারক ব্যাপার। তবে অসাধকের নিকট কোন তত্ত্বই যে সহজ নহে—সবই যে প্রহেলিকায় পূর্ণ কুয়াসায় আবৃত দুঃখে ভরপুর, তাহা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না।

মৃত্যুলীলা

'মৃত্যু' শব্দ মৃ ধাতুর উত্তর তুকন্ প্রত্যয় করিয়া সাধিত হইয়াছে। মৃ ধাতুর অর্থ পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হওয়া, কারণে লয় হওয়া—আত্মার স্বরূপবিকাশের জন্য তাহার উপর যে পঞ্চ-কোষের একটা আবরণ কল্পিত হইয়াছিল সেই আবরণগুলি দূর হওয়া। সাধারণ মৃত্যুতে আমরা শুধু অন্নময় কোষের আবরণটা দূর করিয়া ফেলিয়া দিয়া আত্মার প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দ-ময় কোষ লইয়া স্থূল দৃষ্টির অবিষয়ীভূত হওয়াকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। মৃত্যু অ-সাধকের দুঃখের কারণ হইলেও সাধকের পঞ্চকোষ-বিবেকের সাহায্যে দেহাত্মবুদ্ধি দূর করিয়া স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হইয়া পরমানন্দলাভের ভগবৎপ্রাপ্তির ভগবৎঅনুভূতির প্রধান সহায়। উপনিষদের মতে মৃত্যুর ভিতর দিয়া আমরা অমৃতের আস্বাদ লাভ করিয়া থাকি। ভাষ্যকার মহী-

ধরের মতে স্বাভাবিক কর্ম্মজ্ঞানই মৃত্যুশব্দবাচ্য 'স্বাভাবিক-কর্ম্মজ্ঞানং মৃত্যুশব্দবাচ্যম্'[১]। মৃত্যু অবিদ্যাপ্রসূত দ্বৈতবুদ্ধি (Knowledge of relativity)—এই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া দ্বৈতবুদ্ধি দূর করিয়া আমরা সেই অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব-রূপ ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইয়া থাকি। সেখানে অবিদ্যাপ্রসূত দ্বৈতবুদ্ধি, দ্বন্দ্বভাবাপন্ন এই জগৎপ্রপঞ্চই মৃত্যুশব্দ-বাচ্য। নাম-রূপ এবং তজ্জনিত অজ্ঞানসংস্কারই তো আমাদের সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের আনন্দময় মুখখানিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্মমৃত্যুময় আবরণখানি দূর করিয়া জন্মমৃত্যুর অতীত দেশে গিয়া মৃত্যুঞ্জয় উপাধি লাভ করিয়া জন্মমৃত্যুর খেলার মধ্যে উদাসীন ভাবে লীলারত থাকিয়া ভগবৎভাবে ভাবিত হইয়া ভগবৎস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়াই যে আমাদের সমস্ত সাধন-ভজনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

দর্শন-শাস্ত্রের মতে আত্মা অজর অমর। আমাদের দেহেন্দ্রিয়গুলি একবার তাহাতে যুক্ত হয় আবার তাহা হইতে বিযুক্ত হয়। এই সংযোগ হওয়ার নাম জন্ম আর বিয়োগ হওয়ার নাম মৃত্যু। স্বাভাবিক মৃত্যুতে আমাদের জরা উপস্থিত হইলে এখানকার এ খেলা শেষ হইতে বসিলে সাপের খোসা ত্যাগের ন্যায় আমরা আমাদের এই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া থাকি। এই শরীরত্যাগের নামই মৃত্যু। তত্ত্বজ্ঞ সাধক এই জীর্ণ বস্ত্রের অনাবশ্যকতা কার্য্যে অপারগতা দর্শন

করিয়া মৃত্যুর মধ্য দিয়া নূতন কার্য্যক্ষম বস্ত্রের—লীলাত্মক দেহলাভের সম্ভাবনা দেখিয়া মৃত্যুকে এত আদরে বরণ করেন, মৃত্যুতে এত আনন্দ প্রকাশ করেন। তারপরে যদি এই স্থূল দেহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহেরও মৃত্যু সাধন করিয়া অবিদ্যাজনিত যাবতীয় অধ্যাস দূর করিবার সুযোগ পান, তবে তো আর তাঁহাদের আনন্দের কথাই নাই, সীমাই নাই! তৃণ কাষ্ঠ ও রজ্জু মিলাইয়া ঘর, জল মাটি ও বায়ু মিলাইয়া ঘট, ক্ষিতি জল ও বীজ মিলাইয়া গাছ প্রস্তুত করা হইয়াছিল; পঞ্চভূতের নিকট হইতে পঞ্চতত্ত্বের নিকট হইতে কতকগুলি জিনিস ধার করিয়া কিছু সময়ের জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধির আশায় আমাদের এই দেহটি প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রয়োজন সিদ্ধির পরে অবয়বগুলির সংযোগ দূর করিয়া সমস্ত দেনা শোধ করিয়া যাবতীয় ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বরূপপ্রতিষ্ঠা লাভের সহায়রূপে মৃত্যুকে গ্রহণ করিয়া জ্ঞানী সাধক ভক্ত ইহাকে এত আনন্দের সহিত বরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট মরণ যেন একটা আত্যন্তিক বিস্মৃতি—অধ্যাসের নিবৃত্তি। যে কারণগুলি জীবকে এতদিন একটা দেহে আবদ্ধ করিয়া নানারূপে সীমাবদ্ধ করিয়া অশেষভাবে লাঞ্ছনা ভোগ করাইতে সচেষ্ট ছিল, মৃত্যু আজ সে সব সংস্কার অজ্ঞানতা অধ্যাস দূর করিয়া যাবতীয় দেহাত্মভাবের বিস্মরণ স্বরূপ-গত

ভাবের স্ফুরণের মধ্য দিয়া তাহার পরম কল্যাণের সহায় হইয়া তাহার প্রচুর কল্যাণ সাধন করিয়া তাহার প্রাণের কৃতজ্ঞতা গ্রহণের সুযোগ পাইল। মৃত্যু আবরণবিশেষের নিবৃত্তি, মৃত্যু সমস্ত দেনা শোধের সহায়, মৃত্যু স্বরূপ-উপলব্ধির ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়, তাই জ্ঞানীরা এই মৃত্যুর সাহায্যে মৃত্যুঞ্জয়-পদ লাভ করিয়া থাকেন।

জীব্ ধাতুর অর্থ প্রাণধারণ আর মৃ ধাতুর অর্থ প্রাণত্যাগ; সুতরাং সাধকগণ এই জীবনমরণ-রহস্যের মধ্য দিয়া গ্রহণ ও ত্যাগাত্মক দ্বন্দ্বভাব দূর করিয়া দ্বন্দ্বাতীত উদাসীন জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞানী জন্মমৃত্যু-রহস্য অবগত হইয়া জন্মমৃত্যুর উপরে উঠিয়া উপরে বসিয়া উদাসীন ভাবে জন্মমৃত্যু-লীলার ভিতর দিয়া আনন্দ-রস আস্বাদ করেন—রসিক-শেখর বাল গোপালের সহজ সুন্দর বাল্যলীলার সহায় হইয়া থাকেন। অজ্ঞানীরও কিন্তু জন্ম-মৃত্যুকে অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাহাতে অবিচলিত থাকিতে চেষ্টা করা উচিত। "মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে। অদ্য বাব্দ-শতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥" জন্মিলেই মরিতে হইবে, তবে তাহা আজ আর কাল। গীতায়ও শ্রীভগবান 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ' এই কথার ভিতর দিয়া এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

আমাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে প্রকৃতি

দেবীই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সচেষ্ট। এই বাঁচাইবার সমস্ত কাজ তিনিই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমরা আমাদের চিকিৎসকগণ শুধু তাঁহাকে তাঁহারই প্রদত্ত এই দেহ-মন দ্বারা একটু সাহায্য করিয়া থাকি মাত্র। যখন প্রকৃতি আর এই দেহরক্ষার কোনও আশাভরসা দেখিতে পান না, তখনই তিনি বেশ সুন্দর ভাবে বুঝিতে পারেন যে, যে উদ্দেশ্যে এই দেহ সৃষ্ট হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে সাধিত হইয়া গিয়াছে, ভিতরে ভিতরে ইহার যাবতীয় প্রাক্তন ক্ষয় হইয়া গিয়াছে; তখনই তিনি এই দেহের অনাবশ্যকতা এবং অপর একটী ভাল দেহের আবশ্যকতা মনে করিয়া এই দেহনাশের ব্যবস্থা করিয়া দেন। যাহাকে আমরা অকাল-মৃত্যু হঠাৎ-মৃত্যু বলিয়া থাকি, তাহার ভিতরেও জ্ঞানিগণ একটা গূঢ় কার্য্যকারণসম্বন্ধ অবগত হইয়া সমস্ত জন্মলীলার মধ্যে মা ভগবতীর কৃপাপূর্ণ আলিঙ্গনোদ্যত অভয় কর সন্দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যান। জ্যোতিস্তত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায় আয়ুষ্কাল ক্ষয় হইলে মন্ত্র-তন্ত্র আদি কিছুতেই তাহাকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয় না। "যেরূপ প্রদীপে বর্ত্তি ও তেল থাকিতেও বায়ু তাহাকে নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়, সেইরূপ আয়ু থাকিতেও কারণ-বায়ুতে মানুষের জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।" ফলিত জ্যোতিষ ও বৈদ্যক-শাস্ত্র মৃত্যুর কাল নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া মৃত্যু বিষয়ে মানুষের

যে কোনও হাত নাই, তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মৃত্যুর আদিকর্ত্তা মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব, মৃত্যুর অধিনায়ক স্বয়ং আকাশ-তত্ত্বাধিপতি যম, আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার করিয়া পরলোকের গতি নির্দ্ধারণ করেন বৃদ্ধ চিত্রগুপ্ত। ইহাঁরা প্রত্যেকেই যে আমাদের পরম হিতৈষী, মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে লইয়া গিয়া আমাদেরে অমৃত-তত্ত্বের আস্বাদপ্রদানে সদাই তৎপর, তাহা আমরা এখন আর সংস্কারপ্রভাবে অনুভব করিতে পারি না।

জন্ম আর সৃষ্টি, মৃত্যু আর লয় আসলে যে একই জিনিস—একভাবেই সাধিত হয় সৃষ্টি যেমন অব্যক্ত হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন, জন্মও ঠিক তেমনি অব্যক্তাবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থায় আগমন। আবার লয় যেমন ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তে প্রত্যাগমন, মৃত্যুও ঠিক তেমনি ব্যক্তাবস্থা হইতে অব্যক্তে প্রত্যাগমন। অজ্ঞানীর নিকট অব্যক্ত-তত্ত্বটা খুব বেশী পরিমাণেই অব্যক্ত। তাহার জীবনে তাহার বিচারে অদৃষ্ট-তত্ত্বেরই প্রভাব বেশী লক্ষ্য হইয়া থাকে। সে অতি সহজেই বিনা চেষ্টায় কার্য্য-কারণসম্বন্ধের দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে না গিয়া তাহার জীবনের তাহার অনুভূতির অধিকাংশ তত্ত্বকেই অদৃষ্টের অদৃশ্যের অজ্ঞাতের কোঠায় ফেলিয়া দিয়া একটা আরামের দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া অব্যাহতি লাভ করিতে চেষ্টা করে। জ্ঞানী কিন্তু এত সহজে তৃপ্ত হইবার

তৃপ্ত থাকিবার মানুষ নহে। সে সব জিনিসের মধ্যেই একটা কার্য্য-কারণসম্বন্ধ বাহির করিতে গিয়া বাহির করিয়া ফেলে অদৃষ্টের অনেকখানি গুপ্ত রহস্য। তাহার জ্ঞান যত বাড়িতে থাকে তাহার অদৃষ্টের সংখ্যা অদৃষ্টের সীমানাও তত কমিতে থাকে। সে খুব আশা করে যে তাহার জীবনে এমন একটা দিন আসিবে, যখন সমস্ত অদৃষ্টগুলিই দৃষ্ট হইয়া সে জ্ঞানালোকে সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবে; ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে কিছুই তাহার নিকট আর অজ্ঞাত থাকিবে না। তাহার এইজাতীয় একটা উচ্চ আশা দেখিয়া তুমি আমি তাহাকে বাতুল বলিলেও তাহাতে কিন্তু তাহার দুঃখ বা বিরক্তি ঘটিবার সম্ভাবনা কম। সে যদি নিজের পায় দাঁড়াইয়া অহংকারের শক্তিতে বিশ্বাস করিয়া একথা বলিত, তবে তাহাকে অহংকারী বলিয়া নিন্দা করিতে পারিতে। কিন্তু তাহার যে জ্ঞানশক্তির অনেকটা বিকাশ পাওয়ার ফলে ভিতরকার সমস্ত জ্ঞানের উৎসের দিকে—ভগবানের চিৎ-বিভূতির দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেখানকার সত্য যে বাহিরের স্থূল কল্পিত সত্য হইতে কোটীগুণ বেশী সত্য বেশী উজ্জ্বল। সে সত্য যে সে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারে না। সে তাহার নিজের সত্তায় যত বিশ্বাসী, তাহার ভিতরকার জগতের ভিতরকার সেই মহান সত্তায় সেই চৈতন্যস্বরূপে, সে যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী বিশ্বাসী

হইয়া পড়িয়াছে। স্থূলদর্শীর নিকট স্থূল দৃশ্যগুলি যেমন সত্য, সূক্ষ্মদর্শীর নিকট সূক্ষ্ম দৃশ্যগুলি যে তদপেক্ষা বেশী সত্য, আর আত্মদর্শীর নিকট আত্মতত্ত্বই যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সত্য। সে জানিয়াছে জগতে সেই মূল সত্তা সেই মূল চিৎশক্তি কি ভাবে অনুস্যূত অনুপ্রবিষ্ট এবং তিনি কিরূপ স্বয়ংপ্রকাশ। আলোর স্বভাব যেমন প্রকাশ করা প্রকাশিত হওয়া, তাঁহার স্বভাবও ঠিক তেমনি আপন জ্যোতি আপন চিৎ-বিভূতি আপন স্বরূপ প্রকাশ করা—সব আধারগুলির মধ্য দিয়া ফুটাইয়া বাহির করা। তিনি চান প্রকাশ পাইতে, আমাদের অজ্ঞানতা আমাদের কুসংস্কার তাঁহার প্রকাশে সাময়িক বাধা দিতে চেষ্টা করে—তাহাও তাঁহারই বিধানমতে, তাহার উপরও তাঁহার পূর্ণ কর্তৃত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা যতটা ধারণায় আনিতে পারিব তাহার বেশী প্রকাশ পাইতে গেলে আমরা তাঁহাকে আস্বাদ করিতে পারিব না, আমাদের সে খাদ্য হজম হইবে না; তাই তো তিনি আমাদের ধারণাশক্তির ঠিক অনুপাত অনুসারে আপনার শক্তি সৌন্দর্য্য জ্ঞান আনন্দ আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকে বুদ্ধির দোষে তাঁহাকে নির্দ্দয় হৃদয়হীন কপট বলিয়া গালাগালি করিলেও তিনি সেদিকে যে মোটেই লক্ষ্য রাখেন না। চিকিৎসক মা-বাপ আত্মীয়স্বজন রোগীকে কুপথ্য না দেওয়ার জন্য

যে কতরূপ গালাগালি খান—লাঞ্ছনা ভোগ করেন, তাহা দেখিয়া, ইহার ভিতরেও প্রেমতত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া ভক্ত ভগবৎপ্রেমরহস্য আস্বাদ করিতে চেষ্টা করেন। আমি তাঁহাকে প্রকাশ করিব, ইহা আমার পক্ষে বিশেষ স্পর্দ্ধার কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি আমার নিকট প্রকাশিত হইবেন, আমার নিকট প্রকাশ পাওয়া প্রকাশিত হওয়াই যে তাঁহার স্বভাব, তাঁহার এই প্রকাশকে অসম্ভব মনে করা অসম্ভব বলিয়া প্রকাশ করিতে যাওয়াও যে আমার কম অসম সাহসের কম আস্পর্দ্ধার কথা নহে! বিশ্বাসীর বিশ্বাসে জ্ঞানীর উচ্চ আশায় বাধা দেয় কার সাধ্য? তাঁহাদের এই বিশ্বাসের এই আশার মূল কোথায় জান তো? অচল-প্রতিষ্ঠের পক্ষে আর কি চঞ্চলতাজনিত তুফানজনিত ভয়ের সম্ভাব থাকিতে পারে? আসল কথা এই হইল যে জ্ঞানী অজ্ঞানীর ন্যায় এত সহজে অদৃষ্টের আশ্রয় লইয়া তৃপ্ত থাকিতে চায় না, তৃপ্ত থাকিতে প্রস্তুত নহে। যাহা তোমার আমার নিকট অব্যক্ত অদৃষ্ট তাহার অনেকখানি যে তাহার নিকট ব্যক্ত ও দৃষ্ট তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাই এই জন্ম ও মৃত্যু-তত্ত্ব, সৃষ্টি ও লয়-রহস্য তোমার আমার নিকট এতটা মায়ার কুয়াসায় অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকার জন্য এইভাবে কষ্টপ্রদ; কিন্তু জ্ঞানিগণ ইহার সূক্ষ্ম ও কারণতত্ত্ব অবগত হইয়া ইহার মধ্য দিয়া ভগবৎ-কৃপারহস্য

অবগত হইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যান। অজ্ঞানী দেখে শুধু সীমাবদ্ধ স্থূল চক্ষু দিয়া, তাই কোনও জিনিস স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও কারণতত্ত্বে লীন হইলে তখন সে তাহার একান্ত বিনাশ কল্পনা করিয়া দুঃখবোধ করে—হতাশ হইয়া পড়ে। জ্ঞানী দেখেন তাঁহার ভগবদ্দত্ত অসীম দিব্য চোখ দিয়া, যাহা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ভেদ করিয়া স্বরূপ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিতে অভ্যস্ত; তাই কোনও জিনিসকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে বা কারণে লয় হইতে দেখিয়া, তাহার সেখানকার উন্নত রূপ উদার ভাব ও অবাধিত গতি দেখিয়া তিনি বরং বিশেষভাবে আনন্দ লাভ করিতে আরম্ভ করেন। যাহারা শুধু স্থূলদর্শী স্থূল-সর্ব্বস্ব তাহারাই স্থূলের উৎপত্তিকে জন্মতত্ত্বকে সৃষ্টিতত্ত্বকে একটা অস্বাভাবিক আনন্দের কারণ মনে করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠে; এবং তাহারই প্রতিক্রিয়ার ফলে কারণে লয় হওয়াটাকে মৃত্যুতত্ত্বকে সূক্ষ্মদর্শনের অভাবে একটা শূন্যে লয় হওয়া একান্ত-ভাবে লোপ পাওয়া মনে করিয়া বিশেষভাবে বিচলিত হইয়া পড়ে। জ্ঞানী এজন্য সৃষ্টি ও লয়ে জন্ম ও মৃত্যুতে ভগবানের হাত দেখিয়া তাহার মধ্য দিয়া ভগবৎলীলা-রহস্য আস্বাদ করিয়া উভয়কে সমানভাবে আনন্দের সহিত গ্রহণ করেন।

সৃষ্টি ও লয়, জন্ম ও মৃত্যু কতকটা ঢেউএর ওঠা-নামার মত। উঠলেই নামতে হয় নামলেই আবার উঠতে হয়। এই উঠা-নামাটা অন্ততঃ ততক্ষণ বর্ত্তমান

থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলটা স্বাভাবিক শান্ত অবস্থা লাভ না করে। তার পরে যাহারা উঠা-নামাকেই জলের স্বরূপ মনে করে তাহাদের নিকট যে আর এ খেলার বিরাম নাই! আমরা কিন্তু জলের শান্ত ও চঞ্চল এই উভয় রূপকেই স্বীকার করি, উভয় রূপকেই ভালবাসি। ঢেউগুলি যখন জলেরই বুক হইতে উঠে নামে, জলেরই বুকের উপর নৃত্য করে লীলা করে, আবার ঐ জলেরই বুকে গিয়া লয় হইয়া যায়, তখন জলের শান্ত ও চঞ্চল উভয় অবস্থাই আমাদের নিকট সমান আদরের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে। যাঁহারা শুধু ভগবানের নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরাকার ব্রহ্ম-ভাব ভালবাসেন, তাঁহারা সৃষ্টি দেখিয়া সৃষ্টির নাম শুনিয়া ভয় পান! জন্মটা তাঁহাদের নিকট যেন একটা জেলখানায় সাজা ভোগ মাত্র। এই পুনর্জ্জন্ম-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের নিকট কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিয়া থাকেন—'পুনর্জ্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি শম্ভো'। ইহাঁরা লয়-যোগ ভালবাসেন, শ্মশানে মশানে যোগ-ধ্যানে সমাধিমগ্ন হইয়া থাকিতে ইঁহারা বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। জন্মটা ইহাঁদের চোখে শুধু একটা কর্ম্মভোগ কষ্টভোগ যাতনাভোগ বিশেষ; তাই ইহাঁরা মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতের আস্বাদনে সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তের পিছনে ছুটিয়াছেন। শূন্যের পিছনে যদি

একটা সত্য বর্ত্তমান না থাকিত, তবে আমরা ইহাকে অতি সহজেই অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতাম। ঋষি-মুনিগণ সাধকগণ ভগবানের জীয়ন্ত বিগ্রহস্বরূপ অবতারগণ এই লয়ের সংহারমূর্ত্তির পিছনে শিবের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া শিবের আনন্দস্বরূপে প্রলুব্ধ হইয়া লয়-যোগের মহিমা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধও যে শূন্যের পিছনকার সত্যটিকে অগ্রাহ্য করিতেন, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না; তবে সে বিষয়ে কোনও কথা উঠিলে তখন প্রায়ই তিনি চুপ করিয়া থাকিতেন। অমন পবিত্র মধুর সার তত্ত্বকে তিনি কল্পনা দ্বারা ভাষা দ্বারা কলুষিত সীমাবদ্ধ বিকৃত করিতে কিছুতেই প্রস্তুত ছিলেন না। ইহাঁদের মধ্যে অনেকে শিবত্বের নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরাকারভাবে লীন হইয়া আর তাহার সগুণ সক্রিয় সাকার তত্ত্বের দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিবারও সুযোগ পান নাই। ভারতের বৈদিক যুগের সাধকগণ লয়-যোগ ভালবাসিতেন শূন্যের পিছনকার সত্য তত্ত্বটিকে দর্শন করিবার জন্য, আস্বাদ করিবার জন্য। একবার তাঁহার সেই তুরীয় স্বরূপটি দর্শন করিয়া তাঁহাকে লইয়া তাঁহার সুষুপ্তি স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার মধ্য দিয়া তাঁহার কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপের সাহায্যে তাঁহার লীলারস আস্বাদ করিবার দিকেই ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। জ্ঞানী লয়কে মৃত্যুকে ভালবাসেন তাঁহার শ্রীভগবানের বিলাস-

বিভূতি মনে করিয়া, ইহাদের সাহায্যে ইহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাঁহারা মৃত্যুঞ্জয়কে দর্শন করিয়া নিজেরা মৃত্যুঞ্জয় উপাধি লাভ করিয়া জন্ম-মৃত্যু ও সৃষ্টি-লয় তত্ত্বকে একটা খেলায় একটা লীলারহস্যে একটা অভিনয়বিশেষে পরিগণিত করিয়া তুলিবার জন্য। যে ব্যক্তি সমস্ত তত্ত্বটা অবগত নহে সে-ই তত্ত্ববিশেষে ভাববিশেষে আসক্ত হইয়া অন্য তত্ত্ব অন্য ভাব আস্বাদে বঞ্চিত থাকিয়া পূর্ণত্বলাভে অসমর্থ হইয়া পড়ে। তাই জ্ঞানী সাধক সৃষ্টি ও লয়ের জন্ম ও মৃত্যুর পরপারে কি আছে তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া, নিজের অজর অমর নিত্য সর্ব্বগত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, তাহার পরে সগুণ-নির্গুণ সাকার-নিরাকার উভয় ভাবকে সমানভাবে স্বীকার করিয়া সমানভাবে গ্রহণ করিয়া ভগবৎ-লীলারহস্যে বিভোর হইয়া যান। আমরা কিন্তু আমাদের প্রাণারামের উভয় অবস্থাই সমান ভাবে স্বীকার করিয়া, উভয় ভাবের ভিতর দিয়া তাঁহার লীলারস-বিস্তারের সহায় হইয়া, তাঁহার কাজে তাঁহার খেলায় তাঁহার আনন্দরসাস্বাদনে তাঁহার সহিত যোগদান করিব। মহাপ্রলয়ে তাঁহার কারণ-শরীরে তুরীয়ভাবে লীন অবস্থাটা আমরা আমাদের সমাধির সময় আস্বাদ করিতে চেষ্টা করিব। তার পরে তাঁহার সূক্ষ্ম ভাবগুলি তত্ত্বগুলি লীলা-রহস্যগুলি ধ্যানযোগে, এবং স্থূল বিভূতিগুলি জাগ্রত অবস্থায় সেবা-

ত্মক সাধনের ভিতর দিয়া আস্বাদ করিতে চেষ্টা করিব। জন্ম ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও লয় তাঁহারই লীলা-বিভূতির অন্তর্গত বলিয়া আমরা এই উভয় তত্ত্বকেই সমানভাবে আদরের সহিত গ্রহণ করিব। আমরা যখন যতক্ষণ জাগিয়া থাকিব, তখন ততক্ষণ তাঁহার স্থূল বিশ্বরূপ লইয়া খেলা করিব—স্থূল বিশ্বরূপের সেবা করিব; আবার যেই আমাদের ঘুম পাইবে অমনি কিছু সময়ের জন্য স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার স্থূল রূপটা একটু ভুলিয়া গিয়া তাঁহার সূক্ষ্ম ও কারণ-রূপ আস্বাদনের জন্য তাঁহারই কোলে ঢলিয়া পড়িব, তাঁহারই সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িব। জ্ঞানী সাধকগণ এই জাগরণ ও নিদ্রাতত্ত্বের মধ্য দিয়া জন্ম ও মৃত্যু সৃষ্টি ও লয়-রহস্য আস্বাদ করিয়া আনন্দসমাধিতে বিভোর হইয়া যান।

অনেকে ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব ও লীলাতত্ত্বে একটা অস্বাভাবিক ভেদভাব কল্পনা করিয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপের কতকটা আভাস দিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। আমি কিন্তু তাঁহার লীলাতত্ত্বকেও তাঁহারই স্বরূপের অন্তর্গত মনে করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি। তবে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য সময় সময় প্রাচীন ঋষিদের অনুসরণে তাঁহার অব্যক্ত তুরীয়ভাবকে স্বরূপ বলিয়া এবং ব্যক্ত সগুণভাবকে লীলা বলিয়া প্রকাশ করিতে হইবে। স্বরূপ ও লীলাতত্ত্ব

নির্গুণ ও সগুণ-তত্ত্ব নিরাকার ও সাকার-রহস্য একটু ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিলে লয় ও সৃষ্টিতত্ত্ব মৃত্যু ও জন্মরহস্য কিন্তু ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে না। যে কারণে যে ভাবে নাম-রূপের অতীত অব্যক্ত অসৎ অব্যাকৃত বাক্য-মনের অগোচর তত্ত্ব নাম-রূপে ব্যাকৃত সৎ ব্যক্ত ধারণ-যোগ্য অনুভব-বেদ্য হইয়া প্রকাশ পাইলেন, যে কারণে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় নিরাকার তত্ত্ব সগুণ সক্রিয় সাকার-রূপে প্রতীয়মান হইলেন, যে কারণে ব্রহ্ম জগৎরূপে, রজ্জু সর্প-রূপে, সুবর্ণ কটকাঙ্গদ-নূপুর-রূপে, এক বহুরূপে, Being becoming-রূপে, শান্ত জল তরঙ্গরূপে, আনন্দতত্ত্ব সুখ-দুঃখরূপে, জ্যোতি প্রকাশ-অপ্রকাশরূপে, সৎ উৎপত্তি-বিনাশরূপে, উদাসীন (neutral) ধন-ঋণ (positive+negative)-রূপে, শূন্য অনন্ত যোগ-বিয়োগ (+ ০,— ০)-রূপে বিবর্ত্তিত পরিণতিপ্রাপ্ত অনুভূত ও বর্ণিত হইতে আরম্ভ করিলেন তাহা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে ভগবানের সৃষ্টি ও লয়-রহস্য, জন্ম ও মৃত্যু-রহস্য কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইবে না। সাধন-পথ অবলম্বনে প্রাচীন ঋষিদের সাহায্যে ভগবৎকৃপা স্মরণ করিয়া অব্যক্ত যে কিভাবে ব্যক্ত হন, স্বয়ংপ্রকাশ যে কি ভাবে প্রকাশ পান, নির্গুণ যে কি ভাবে সগুণ-রূপে শোভা পান, নিরাকার যে কেন কি ভাবে অখণ্ড সাকার-রূপে

প্রতীয়মান হন, এক যে কেন বহুরূপে, অবিভক্ত যে কেন বিভক্তরূপে আপন লীলামাধুরী বিস্তার করিতে বসেন, সে তত্ত্ব সমাধিযোগে অনুভব করিতে দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষীভূত করিতে চেষ্টা করা উচিত। মায়া যোগমায়া স্বরূপ-বিস্মৃতি যে কি ভাবে সৃষ্টির জন্মের বিকাশের প্রকাশের লীলার সহায় হন, তাহাও যে বেশ সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করা দরকার। 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' পরম ইন্দ্রজালবিশারদ কি ভাবে তাঁহার আবরণ-বিক্ষেপ শক্তির সাহায্যে এক হইয়াও বহুরূপে অনন্তভাবে বিবর্ত্তিত পরিণত বিকাশপ্রাপ্ত হন, তাহা না বুঝিলে যে সৃষ্টি ও লয়-তত্ত্ব জন্ম ও মৃত্যু-রহস্য শ্রীভগবানের লীলামাধুরী কিছুতেই আস্বাদ করিতে সক্ষম হইবে না। একই বহু হইলেন, একই বহুরূপে বিবর্ত্তিত বা পরিণতিপ্রাপ্ত হইলেন, একই নাম-রূপে পরিকল্পিত অনন্তরূপে পরিশোভিত জগৎ-জীবরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া সে সব বিচিত্র বিভিন্ন পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন তত্ত্বগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট অনুস্যূত রহিয়াছেন —একই বহুর স্বরূপ, একই বহুর অন্তরাত্মা, একই বহুর সার-তত্ত্ব ; সুতরাং এককে জানিলেই যে বহুকে জানা যায়, জানা হয় ; এককে ঠিকভাবে ধরিতে না পারিলে যে বহুকে ধরা যায় না, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। 'একে বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি' এককে ভাল করিয়া জানিলে

সব জানা হইবে, এই শ্রুতিটির প্রকৃত মর্ম্ম আমাদিগকে বেশ সুন্দরভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। এক হইতেই যখন সকলেরই উৎপত্তি, একই যখন ভিন্ন ভিন্ন ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে এই বিচিত্র তত্ত্বরূপে বিবর্ত্তিত বা পরিণত হইয়াছেন, সমস্ত তত্ত্বগুলিই যখন একভাবের ছাঁচে ঢালা, সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের মধ্যেই যখন একজাতীয় নিখিল তত্ত্ব বর্ত্তমান থাকিয়া আধারের বিচিত্রতা হেতু বিবিধভাবে প্রকাশপ্রাপ্ত, সমস্ত বস্তু সমস্ত তত্ত্বই যখন বিশেষভাবে পরস্পরসম্বদ্ধ, তখন আমরা যে কোনও বস্তু লইয়া একটু ভালভাবে আলোচনা করিতে অনুভব করিতে পারিলে যে সমস্ত বস্তুতত্ত্বই আমাদের নিকট আস্তে আস্তে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে তাহাতে আমাদের কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। স্বরূপ ও লীলার ভিতরে যোগমায়ার প্রভাব, সৃষ্টি ও লয়ের ভিতরে মহামায়ার অলৌকিক ইন্দ্রজাল, জন্ম ও মৃত্যুর ভিতরে মা আনন্দময়ীর অসীম লীলারহস্য একটু বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। উপনিষদের আত্মক্রীড় আত্মরতি আত্মমিথুনের ক্রিয়ারহস্যের ভিতর দিয়া, বৈষ্ণবশাস্ত্রের আনন্দময় সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম রসিক-শেখর বালগোপালের আপনার রূপে আপনি বিভোর হইয়া আপনাকে আপনি আলিঙ্গন করিতে যাইবার একটা প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া, বেদের সেই স্বয়ংপ্রকাশ রসস্বরূপের

আপনাকে আপনি প্রকাশ করিবার জন্য আস্বাদ কারবার জন্য আপন মায়ার সাহায্যে বহু হওয়ার একটা ইচ্ছার মধ্য দিয়া, 'স্বমহিম্নি ইব স্থিতঃ' আনন্দময়ের আনন্দপ্রাচুর্য্য হেতু আনন্দ-রসসাগরকে একটু তরঙ্গায়িত করিয়া একটা কল্পিত বাহিরভাবের মধ্য দিয়া উথলিয়া পড়ার ভিতর দিয়া, আনন্দময়ী আদ্যাশক্তি মহামায়ার স্বয়ংতৃপ্ত শক্তিমানকে একটু আনন্দ দিবার একটা অসার কল্পনার মধ্য দিয়া প্রাচীন ঋষিগণ এবং পরবর্ত্তী দর্শনকারগণ এই জন্মমৃত্যু-লীলারহস্য এই সৃষ্টিতত্ত্বের কতটুকু আভাস দিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন মাত্র।

প্রথমতঃ দেখা যাউক সৃষ্টি ব্যাপারটা কি? কেন সৃষ্টি হয়, কি ভাবে সৃষ্টি হয়, এ সব বিষয় লইয়া দর্শন-শাস্ত্র মহাব্যস্ত—আমাদের এ সময় সে সব গোলযোগের মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলে চলিবে না। কেহ কেহ সৃষ্টিকে আরম্ভক মনে করেন, যেমন ন্যায়দর্শন; তাঁহাদের মতে অসৎ (নাম-রূপ দ্বারা অব্যাকৃত) হইতে সৎএর উৎপত্তি হইয়া থাকে। সাংখ্য ও বেদান্ত প্রকৃত তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য সৃষ্টির সৃষ্টের জগতের একটা উৎপত্তি স্বীকার করিলেও ইহাকে বীজাঙ্কুরবৎ অনাদি বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের মতে সৃষ্টি অভিব্যক্তি পরিণতি বা বিবর্ত্তন, কারণের কার্য্যভাবে আগমন বা আগমনরূপ কল্পনাবিশেষ। কিভাবে

এই সৃষ্টিকার্য্য পরিসাধিত হয়, কিভাবে প্রকৃতি মহৎ অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্রাদি তত্ত্বে পরিণত বিবর্ত্তিত হইয়া এই জগৎজীবাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ক্রিয়া সাধন করেন, সে তত্ত্ব দর্শনকারগণ অনেকটা বর্ত্তমান বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলির অনুকূলভাবে বেশ সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কেন সৃষ্টি হয়, এ কথার উত্তর দিতে গিয়া দার্শনিকেরা যে খুব সুন্দরভাবে সব তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা সকলে স্বীকার করেন না। সাধকগণ কিন্তু এ বিষয় লইয়া বেশী মাথা ঘামাইতে না গিয়া শুধু আনন্দটুকু আস্বাদ করিয়াই তন্ময় হইয়া পড়েন। তাঁহারা যে ভগবানের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাব লইয়াই আনন্দ পান, আনন্দ করেন; উভয় ভাবই যে তাঁহার স্বরূপের অন্তর্গত। যখন তিনি জাগিয়া থাকেন তখন হয় আমাদের সৃষ্টি ও স্থিতি, আর যখন তিনি অনন্ত-শয়নে ঘুমাইয়া পড়েন তখন হয় আমাদের মহাপ্রলয়। জাগা খেলা করা লীলা করা যেমন তাঁহার স্বভাব, ঘুমান বিশ্রাম করা অনন্ত অক্ষয় তত্ত্ব লইয়া বিভোর থাকাও তেমনি তাঁহারই স্বভাব। গাছ ভাল কি বীজ ভাল, গাছ আগে কি বীজ আগে, ঘুমান ভাল কি জেগে থাকা ভাল, এসব অসার কল্পনা-জল্পনা লইয়া সাধক ভক্ত বৃথা মাথা ঘামাইতে না গিয়া এই উভয় অবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহারা তাঁহাদের

প্রিয়তম পরম প্রেমাস্পদকে আস্বাদ করিতে ব্যাকুল হন।

সৃষ্টি-স্থিতিটা অনেকটা 'জায়তে অস্তি বৰ্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে'র মধ্যে এবং লয়টা অনেকটা 'নশ্যতি'র ভিতরে কল্পিত হইয়া থাকে। জন্মটা উৎপত্তির সদৃশ, বাঁচিয়া থাকাটা স্থিতির মত আর মৃত্যুটা যেন লয়ের মত। এই লয় প্রলয় মহাপ্রলয় যে কি তত্ত্ব তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়াই আমরা মৃত্যুকে একটা ভয়ানক ভীতিসঞ্চারক শূন্যত্বে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছি। সৃষ্টিও নানা প্রকারের, লয়ও নানা প্রকারের। "যং যং কামান্ কাময়তে মন্যমানঃ। সং কামভির্জায়তে তত্র তত্র।" যখনই আমরা কোনও একটা কামনা করি তখনই আমরা সেই কামনার সহিত জন্মলাভ করি, আবার যেই আমাদের সেই বাসনা লয় পায় অমনই আমরা সেই কামনাসম্বন্ধে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হই মৃত্যুকে ভজনা করি। খণ্ড জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়া যে কি ভাবে অখণ্ড জন্ম-মৃত্যু—এমন কি, জন্ম-মৃত্যুর অতীত তত্ত্ব ফুটিয়া বাহির হয়, তাহা আমাদের দেহস্থ কোষাণুগুলির কামনা-বাসনাগুলির আত্মার ক্রমবিকাশতত্ত্বের দিকে একটু চাহিয়া দেখিলেই আমরা বেশ সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিব। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, সৃষ্টি ও লয় জন্ম ও মৃত্যু বিবৰ্ত্তন বা পরিণতি-ক্রিয়ার নামান্তর মাত্র। সুতরাং কিভাবে এই বিবৰ্ত্তন

বা পরিণতি-ক্রিয়া পরিসাধিত হয় তাহা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে, তাহার তত্ত্বটি প্রকৃত স্বরূপটি ঠিকভাবে বুঝিয়া উঠিতে না পারিলে, আমরা জন্মমৃত্যুর প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়া জন্মমৃত্যু সম্বন্ধীয় অসার জল্পনা-কল্পনাত্মক যাতনার হাত হইতে কিছুতেই অব্যাহতি পাইতে পারিব না। কোনও জিনিসের প্রকৃত তত্ত্ব প্রকৃত স্বরূপ জানিতে হইলে তাহার মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সবখানি দেখিতে হইবে জানিতে হইবে বুঝিতে হইবে। জগতের সব পদার্থের সব তত্ত্বেরই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ও তুরীয় অবস্থার কথা শুনা যায়। সুতরাং কোনও পদার্থকে ভাল করিয়া জানিতে হইলে তাহার স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া তুরীয় পর্য্যন্ত সব অবস্থা জানিয়া লইতে হইবে। আমরা জানি, পদার্থের এক-একটি তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য ভগবান আমাদিগকে এক-একটি ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন,—রূপ দেখার জন্য চোখ, শব্দ শুনার জন্য কান, গন্ধ গ্রহণ করিবার জন্য নাক ইত্যাদি। তার পরে ইহাও আমরা জানি যে এই সব ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যেকের সমানভাবে শক্তিসম্পন্ন নহে। ইহা ছাড়া ইহাদের উপযুক্ত অনুশীলনের ফলে সাধক যে দূরদর্শন দূরশ্রবণ আদি শক্তি লাভ করিতে পারেন, তাহাও আমরা অস্বীকার করি না। এই সব গেল স্থূল জগতের স্থূল-তত্ত্বগুলির দর্শন ও অনুভূতির সম্বন্ধে। সূক্ষ্ম ও কারণ

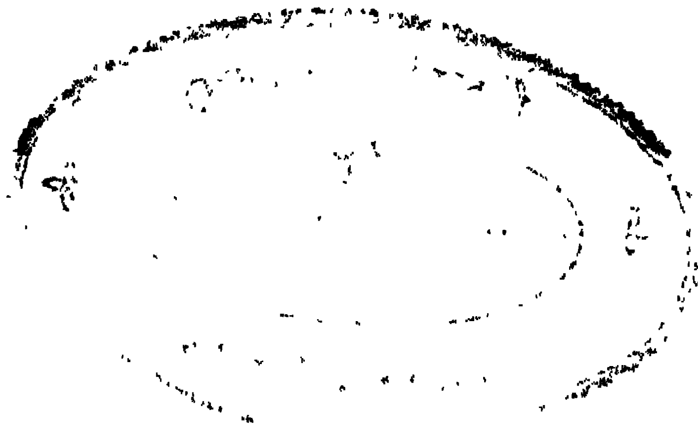
জগতের সূক্ষ্ম ও কারণ-তত্ত্বানুভূতি সম্বন্ধেও শ্রীভগবান আমাদিগকে কতকগুলি দিব্যশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন ; উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে আমাদের স্থূলে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে স্থূল জগতের সংস্কারপ্রভাবে আমরা সেই সব শক্তির অনুশীলন দূরে থাকুক, তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সব সময়ে বিশ্বাসস্থাপন করিতে অভ্যস্ত নহি। কখনও যদি ভাগ্যক্রমে যোগিবিশেষের সাধকবিশেষের দর্শন ও কৃপালাভে সক্ষম হই, তখন আমরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় একটু বিশ্বাস করিয়া লইতে বাধ্য হইলেও কিন্তু পরে সে সব একেবারে ভুলিয়া যাই। ভগবান আমাদিগকে সে সব তত্ত্বের দিকে একটু আকর্ষণ করিবার জন্য সময় সময় মৃত্যুশয্যায় এক-একটি আশ্চর্য্য ঘটনা প্রত্যক্ষীভূত করাইয়া দেন ; কিন্তু কিছু পরে আমরা আবার তাহা ভুলিয়া যাই। যাঁহারা অনেক দিন আগে চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা এখনও সূক্ষ্মদেহে বাস করিতেছেন অর্থাৎ যাঁহারা এখনও পূর্ণমুক্তি বা পুনর্জন্ম লাভ করেন নাই, তাঁহারা অনেক সময় তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুকালে তাহাদের সূক্ষ্মদেহকে লইয়া যাইবার জন্য মৃত্যুন্মুখ ব্যক্তিগণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। আমরা সে সব তত্ত্বসম্বন্ধে অনভ্যস্ত বলিয়া সুশিক্ষার অভাবে কুশিক্ষার প্রভাবে সেগুলিকে একটা প্রলাপ-সংজ্ঞার অন্তর্ভূত করিয়া সে সম্বন্ধে আমাদের

যাবতীয় অজ্ঞানতাকে চাপা দিয়া আমাদের একটা বৃথা কল্পিত জ্ঞানের পরিচয় দিয়া আপন জ্ঞানমহিমা প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়া পড়ি। পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যেও অনেকে একটা সহজ জ্ঞানের (Instinct) দোহাই দিয়া অনেক সময় তাঁহাদের অজ্ঞানতাকে চাপা দিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। বুঝিতে পারা গেল, সাধনা দ্বারা সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা জগতের সূক্ষ্মরাজ্যে কারণরাজ্যে এমন কি তুরীয়ভাবে প্রবেশ করিতে না পারিলে সৃষ্টি-রহস্য জন্মমৃত্যু-রহস্য ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না। প্রাচীন সাধকগণ কোনও অজ্ঞাত তত্ত্বকে জানিবার জন্য ত্রিবিধ প্রমাণের জ্ঞানসাধনের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের নাম—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। বলা বাহুল্য, জ্ঞানিগণ সাধকগণ ভগবৎকৃপায় সাধনবলে ভগবৎবিধানে সমস্ত তত্ত্বই প্রত্যক্ষ করিতে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট সবই প্রত্যক্ষ সত্যরূপে ভাসমান, কিছুই অজ্ঞাত অদৃষ্ট উপলব্ধির অবিষয়ীভূত থাকে না। সাধারণ লোকের ভিতরে অনেক তত্ত্বই—এমন কি, স্থূলতত্ত্বও যে ধারণার অতীত রহিয়া গিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সূক্ষ্ম ও কারণ-তত্ত্বগুলি তো তাহারা কল্পনায়ও আনিতে সক্ষম নহে, সে সম্বন্ধে কল্পনা করিবার সুযোগ বা আবশ্যকতাও তাহাদের চিত্তে স্থান পায় না।

সাধারণ লোক সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহারা যেন আর্ষ-উপদেশ মানিয়া চলিতে চেষ্টা করে। সত্যদ্রষ্টা নিঃস্বার্থপর জীবহিতে রত সিদ্ধ ঋষি-মুনিগণ যে সব তত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়া তাহার অস্তিত্ব ও উপলব্ধির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সে সব সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া না বুঝিয়া একেবারে সেগুলিকে অস্বীকার করিতে যাওয়া যে কিরূপ মূর্খতার পরিচায়ক, তাহা আজকালকার নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে হয়তো সহজে বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হইবেন না। আমি পুকুরপাড়ে একটা সাপ দেখিয়াছি; এখন একথা তোমাকে বুঝাইতে হইলে, হয় তোমাকে আমার কথা বিশ্বাস করিতে হইবে, নতুবা আমার সঙ্গে গিয়া নিজের চোখে সাপটি দেখিয়া আসিতে হইবে। তুমি যদি আমার কথায় অবিশ্বাস কর এবং আমার সঙ্গে পুকুরপাড়ে যাইতে অসম্মত হও, তবে প্রাচীন ঋষিগণের মতে তোমাকে এই সর্পের অস্তিত্ব বিষয়ে জ্ঞানলাভ সম্বন্ধে হতভাগ্য না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। যে জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন-অনুভূতি অনেকটা স্থূলে সীমাবদ্ধ, তাহাদের বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া তাহাদের শিক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকিতে গেলে আমাদের যে সূক্ষ্ম কারণ ও তুরীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক সময় বঞ্চিত থাকিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অনেকে বলেন, পরলোকে আত্মার অস্তিত্বসম্বন্ধে পূর্ব্ব-

জন্মের স্মৃতি সম্বন্ধে আমাদিগকে এতটা অজ্ঞ রাখিয়া বঞ্চিত রাখিয়া আমাদের শ্রীভগবান তাঁহার জ্ঞানের প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন কি না বিশেষ সন্দেহ। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির আবিষ্কার-প্রণালী জীবের ক্রমবিকাশ-রহস্য মানসিক পরিণতির প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া সাধক ভক্তগণ এইজন্য কিন্তু ভগবানকে নির্দ্দয় না বলিয়া দয়াময় বলিয়া উপলব্ধি করিয়া দয়াময় বলিয়া প্রাণ হইতে সম্বোধন করিবার সুযোগ লাভ করিয়া জীবন সার্থক মনে করেন।







সৃষ্টি করিতে হইলেই যে একাকে বহু হইতে হইবে, বহু-রূপীর সাজ পরিতে হইবে, দেবাসুর-রূপে প্রকাশ পাইতে হইবে, যাবতীয় দ্বন্দ্বভাবের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে হইবে, জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, পরিণতি প্রাপ্ত হইতে হইবে।

দ্বন্দ্বময়ী সৃষ্টি

থিয়েটারে রামের যতটা দরকার রাবণেরও যে ঠিক ততটাই দরকার। উভয়ের মাঝখানে থাকিবেন সীতা দেবী মহামায়া মূল প্রকৃতি, ইহার ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইবে একটা অসম্ভব সুবর্ণ-মৃগরহস্য। যে যতটা আপন স্বরূপ না ভুলিয়া সাজের অনুকূল ভাবে ভাবিত হইয়া উঠিতে পারিবে, সে ততটা নিজে মাতিয়া সকলকে মাতাইয়া থিয়েটারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। থিয়েটার দেখিয়া বাহিরের

লীলাতত্ত্ব কতকটা তো বুঝিলে, এখন একবার কোনও মতে সাধন বলে সাজঘরে গিয়া স্বরূপ তত্ত্বটি একটু বুঝিয়া লইতে চেষ্টা কর। কোনওরূপে একবার সাজঘরে যাইতে পারিলে তখন দেখিবে বুঝিতে পারিবে যে, রামও রাম নহে রাবণও রাবণ নহে সীতাও সীতা নহে। সেখানে ইহারা সকলে এক-সঙ্গে বসিয়া আনন্দ-রস আস্বাদ করে, একসঙ্গে বিহার করে, একে অন্যের বেশ-ভূষার কার্য্যকলাপের সহায় হইয়া থাকে। সেখানে কোনও গোলমাল নাই, দ্বেষবুদ্ধি ভেদভাব ঝগড়া-বিবাদ দেখিবার সম্ভাবনাও নাই; যত গোলমাল রঙ্গমঞ্চে গিয়া, তাহাও সকলকে আনন্দ দিবার জন্য লীলাময়েরই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য। যে একবার সাজ ঘরে গিয়া স্বরূপটিকে দেখিয়াছে, সাজের মধ্য দিয়া ভিতরকার আসল মানুষটিকে চিনিয়া লইয়াছে, আসল মানুষের দিকে তাহার লীলাখেলার দিকে তাহার ভিতরকার উদ্দেশ্যটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে, তাহার যে সর্ব্বত্র কেবলী আনন্দই আনন্দ—তাহার যে দেখায় আনন্দ, অনুভব করায় আনন্দ, তাহার সমস্ত ভাবনা কথা ও কাজের মধ্যে আনন্দ ছাড়া আর কিছুই খুঁজিয়া বাহির করা যায় না।......

যে স্বরূপকে ভুলিয়া গিয়া সাজকেই সার বলিয়া ধরিয়াছে, লীলার খেলার রহস্যটা যে কারণেই হউক বুঝিতে মনে রাখিতে সমর্থ হয় নাই, সেই তো এ

সব ঘাতপ্রতিঘাতে কল্পিত দ্বন্দ্বের প্রভাবে বিচলিত হইয়া পড়িতেছে। তবে জ্ঞানিগণ সাধকগণ বেশ সুন্দরভাবে বুঝিতে পারেন যে, কি ভাবে ঐ সব সুখ-দুঃখের হাসি-কান্নার ঘাতপ্রতিঘাতের তুফানগুলির মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া ভগবান তাহাদিগকে জ্ঞানদান করিতে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে আনন্দে বিভোর করিয়া রাখিতে সচেষ্ট রহিয়াছেন। অসতী না থাকিলে যে সতীর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, খারাপ না থাকিলে যে ভালকে ঠিকভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। অন্ধকার যে কি ভাবে আলোককে প্রকাশ করে, আলোর প্রকাশের বিকাশের অনুভূতির সহায় হয়, হিরণ্যকশিপু যে কি ভাবে প্রহ্লাদ-চরিত্রকে ফুটাইয়া তোলে, প্রকাশ করিয়া প্রচার করিয়া অনুভব-যোগ্য করিয়া আস্বাদ্য করিয়া মধুর করিয়া তোলে, তাহা যে প্রকৃত সাধক ছাড়া অন্যের পক্ষে সব সময় বুঝা এবং সব অবস্থায় মনে রাখা সহজ নহে। কেন যে 'একজন সাধক পাপী-তাপী চোর-ডাকাতকেও শ্রেষ্ঠ গুরুরূপে গ্রহণ করেন বরণ করেন সম্মান করেন, তাহা সাধারণ লোকে আর কি করিয়া বুঝিতে পারিবে? সাধু শিক্ষা দেন এক ভাবে, অসাধু আর এক ভাবে; একজন শিক্ষা দেন কি ভাবে চলা উচিত, কি ভাবে চলা উন্নতিলাভের আনন্দপ্রাপ্তির ভগবৎ-দর্শনের সহায়; আর একজন বলিয়া দেন চোখে আঙ্গুল দিয়া

দেখাইয়া দেন, কুপথে যাওয়ার কি দোষ কি ভীষণ পরিণাম! কুপথে চলিতে কুকাজ করিতে আমরা কি ভাবে পদে পদে বাধা পাই, উন্নতিলাভে আনন্দলাভে বঞ্চিত হইয়া অপর সকলকে বঞ্চিত করিয়া তুলি। সাধু হাত ধরিয়া লইয়া যান, অসাধু পদে পদে সাবধান করিয়া দেন,—ইঁহারা উভয়ই আমাদের উন্নতির সোপান কল্যাণের সহায়; আমাদের কল্যাণের জন্য পূর্ণতালাভের জন্য, ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য উভয়ই সমানভাবে আবশ্যক—উভয়ই আমাদের গুরুর ন্যায় হিতকারী। প্রকৃত সাধক ইহাঁদের উভয়েরই আবশ্যকতা সমানভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট হার-জিত উভয়ই খেলার অঙ্গভাবে পরিণতিলাভের সমান-ভাবে সহায় বলিয়া সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে, সাধু-অসাধু উভয়ই সমানভাবে আত্মবিকাশের সহায় বলিয়া তুল্য-রূপে হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। জন্মমৃত্যু উভয়ই আত্মার ক্রমবিকাশের জন্য একান্তভাবে আবশ্যক বলিয়া সমানভাবে গৃহীত হইয়া তাঁহার জ্ঞানবিকাশের আনন্দ-অনুভূতির ভগবৎলীলারস আস্বাদনের সহায় হইয়া পড়ে। তারপরে সাধনপ্রভাবে ভগবৎকৃপায় তাঁহার যে এখন দিব্য-দর্শন লাভ হইয়া গিয়াছে; তাই তিনি যে আজ সমস্ত অসুখের ভিতরে সুখ, নিরাকারের ভিতরে সাকার, অব্যক্তির ভিতরে ব্যক্তি, গতির ভিতরে স্থিতি, মৃত্যুর

ভিতরে অমৃতত্ব, বিভক্তের ভিতরে অবিভক্ত, বহুত্বের ভিতরে একত্বের স্বরূপ দর্শন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যান। আজ যে তাঁহার অভিধানে সুখ অসুখকে অসুখ সুখকে, সাকার নিরাকারকে নিরাকার সাকারকে, অসীম সসীমকে সসীম অসীমকে, এক বহুকে বহু এককে, নির্গুণ সগুণকে সগুণ নির্গুণকে, মৃত্যু অমৃতকে অমৃত মৃত্যুকে প্রকাশ করিয়া আস্বাদ্য করিয়া সমানভাবে আনন্দের সহায় হইয়া দ্বন্দ্বাতীত ভগবৎধামে লইয়া যাইবার সহায় হইয়া পড়ে। এই ভাবের যাবতীয় দ্বন্দ্বভাবই যে তাঁহার প্রকাশের সহায়, লীলার জন্য সমানভাবে আবশ্যক ; ইহারা উভয়েই যেন পরস্পর বিরুদ্ধভাবে প্রতীয়মান হইয়াও তাঁহার সৃষ্টি ও লয়কে তাঁহার জন্মমৃত্যু-রহস্যকে এমন সুন্দরভাবে পরমানন্দ-লাভের সহায় করিয়া তুলিয়াছে। জ্ঞানীর জ্ঞানের মধ্য দিয়া অজ্ঞানীর অজ্ঞতার ভিতর দিয়া যে কি ভাবে ভগবৎউদ্দেশ্য সফল হইতে বসিয়াছে, তাহা তাঁহারা বেশ সুন্দরভাবে বুঝিতে পারেন। উঠা নামা প্রকাশ অপ্রকাশ জানা না-জানার ভিতর দিয়াই যে তাঁহার লীলারস বিস্তার লাভ করিয়া থাকে, দেবাসুরের যুদ্ধের মধ্য দিয়াই যে তাঁহার স্বর্গের পবিত্রতা রক্ষা পাইয়া থাকে। এইজাতীয় দ্বন্দ্বভাবের মধ্য দিয়াই যে তাঁহার মহিমা ঘোষিত হয় লীলা প্রচারিত হয় আনন্দরস অনুভব-বেদ্য হইয়া পড়ে, তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

অজ্ঞান যে কিভাবে জ্ঞানকে ফুটাইয়া তোলে অনুভব-বেদ্য আস্বাদ্য করিয়া দেয়, তাহা বোঝা কিন্তু তত সহজ নহে। সিদ্ধ মহাত্মাদের নিকট জ্ঞান যেমন তাঁহাদের লীলার সহায় হয়, অসিদ্ধ লোকদিগের নিকটে অজ্ঞানতাও যে তেমনি তাহাদের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের শান্তিলাভের সহায়। সাধারণ লোকে যদি ভবিষ্যতের হার-জিত জয়-পরাজয় লাভ-লোকসান আদি তত্ত্বগুলি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিত, তবে কি তাহারা আর খেলা করিতে যাইত, না যুদ্ধ করিতে বা কারবার করিতে প্রস্তুত হইত ? অনধিকারীর পক্ষে দিব্য দর্শন দিব্য শ্রবণ দিব্য শক্তি লাভ যে কিরূপ বিড়ম্বনার কিরূপ অশান্তির কারণ, তাহা আমরা অনেক সময় যেন বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। শ্রীভগবানের সখা আদর্শ শিষ্য অর্জ্জুন পর্য্যন্ত এসব সহ্য করিতে পারেন নাই। একজন অসাধক যদি জানিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে কোথায় কে কি ভাবিতেছে, কে কি করিতেছে ; তবে সে যে একেবারে অস্থির অশান্ত উন্মাদ অবস্থা লাভ করিবে তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। অসংস্কৃত স্বার্থচালিত ইন্দ্রিয়সুখরত ব্যক্তি যদি সমস্ত জন্মমৃত্যু-রহস্য জন্ম-জন্মান্তরীয় সম্বন্ধতত্ত্ব অবগত হইতে সক্ষম হইত, পূর্ব্ব জন্মের সব কথা মনে রাখিতে পারিত, তবে যে তাহার পক্ষে সংসারে বাস করা একান্তভাবে কঠিন হইয়া পড়িত—অনেক সময় অসম্ভব হইয়া উঠিত। পূর্ব্ব জন্মে

কে তাহার কি ভাবে শত্রু বা মিত্র ছিল, কে তাহার সম্বন্ধে কি করিয়াছিল, এসব তত্ত্ব মনে রাখিতে পারিলে অসংযত অসাধকের পক্ষে সমস্ত তাল বজায় রাখিয়া ঠিকভাবে সাজের অনুকূলভাবে সব কাজ নির্ব্বাহ করিয়া যাওয়া যে একটা ভয়ানক কঠিন কষ্টকর ও অশান্তিপ্রদ ব্যাপার হইয়া পড়ে। জ্ঞানিগণ এজন্য বুঝিতে পারেন যে, ভগবান সাধারণ জীবের নিকটে জন্মান্তর-জ্ঞান কার্য্যকারণ-তত্ত্ব ভগবৎলীলারহস্য ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের জ্ঞান কেন গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহার সৃষ্টি আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য আপনাকে আস্বাদ্য করিয়া তুলিবার জন্য, তিনি যে কেন আপনাকে স্থানবিশেষে পাত্রবিশেষে আবৃত করিয়া গোপন করিয়া রাখেন, তাহা আমরা সব সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিনা। যে মার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য একমাত্র আনন্দ তাঁহার ছেলেমেয়েকে আনন্দ দেওয়া আনন্দে রাখা ভাল ভাল খাদ্য খাওয়ান সব তত্ত্ব শিখাইয়া দেওয়া অনুভব করাইয়া দিতে চেষ্টা করা, সে মা যে কেন সময় সময় সেই সকল প্রাণপ্রতিম সন্তানগুলিকে নিজ হাতে তুলিয়া জোর করিয়া কটুতিক্ত ঔষধ সেবন করান, মার ভাণ্ডারে তাহাদেরই জন্য সযত্নে রক্ষিত সুখাদ্য-গুলি গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন, এই সব তত্ত্ব কি মার অবোধ শিশু সন্তানগণ সব সময় ঠিকভাবে বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হয়, না সব সময় মনে রাখিয়া মা-বাবার নিকট সর্ব্বদা

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে? জ্ঞানিগণ সাধকগণ বেশ বুঝিতে পারেন যে, মায়ের সমস্ত ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সুখ শান্তি আনন্দ শুধু তাঁহারই সন্তান-সন্ততিদের কল্যাণের জন্য আনন্দের জন্য।···

আমরা যতদিন মার বিধানমতে প্রকৃত কল্যাণের পথে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে চলিতে থাকিব, ততদিন মার অক্ষয় ভাণ্ডারের কোন তত্ত্বই যে আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকিবে না, মার কোন খাদ্যই যে আমাদের নিকট অলব্ধ দুষ্প্রাপ্য অনাস্বাদ্য থাকিবে না, ততদিন তিনি যে তাঁহার সমস্ত ভাণ্ডারের চাবিগুলি আমাদেরই হাতে ন্যস্ত করিয়া আরাম বোধ করিবেন, আনন্দ অনুভব করিবেন। কিন্তু যখনই আমরা তাঁহার বিধান অমান্য করিয়া কুপথে চলিয়া বিকৃত অশান্ত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ি, তখনই তাঁহার সমস্ত সুখাদ্য আমাদের নিকট দুষ্পাচ্য অস্বাস্থ্যকর কষ্টপ্রদ হইবে জানিয়াই তো তিনি অতি দুঃখের সহিত ঐগুলি আমাদের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়া দেন। ঐ সব দ্রব্য যে সৃষ্ট হইয়াছে আমাদেরই নিমিত্ত, আমাদের সব বিকৃতিগুলি দূর হইয়া গেলে আমরাই যে ঐগুলি ভোগ করিবার অধিকার লাভ করিব, সে ভাবেরও যথেষ্ট ইঙ্গিত আমরা তাঁহার ভাবের ও কাজের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়া থাকি। মা যখনই বুঝিবেন তোমা দ্বারা তোমার নিজের বা অপর কাহারও

কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, তুমি এখন সব জিনিসেরই সংব্যবহার করিতে শিখিয়াছ, তুমি তোমার সংযমের ফলে সাধনের বলে এখন সব রকমের খাদ্য হজম করিতে সব রকমের আনন্দ আস্বাদ করিতে সক্ষম হইয়াছ, তখন মার রাজ্যে তোমার অবাধ গতি অপ্রতিহত প্রভাব উপলব্ধি করিয়া তুমি নিজেই যে আনন্দে বিভোর হইয়া যাইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার কথা ভাব ও কাজ দ্বারা কাহারও অনিষ্টসাধনের সম্ভাবনা থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার যে কতকগুলি কঠোর বিধান মানিয়া চলা আবশ্যক তোমাকে যে কতকটা সংযত রাখা দরকার, তাহা বোধ হয় তুমি অস্বীকার করিতে পার না। যে মা অসুরদের নিকট অসি-মুণ্ডধারিণী, তিনিই যে আবার দেবতাদের নিকট বরাভয়প্রদানে তৎপর। যে মার বিধান-গুলি চোর ডাকাত প্রভৃতি অসুরগণের শাসনে ব্যস্ত, সেই মার সেই বিধানগুলিই যে আবার সংযত সাধু-মহাত্মাদের রক্ষণে নিযুক্ত তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। যে পুলিস যে বিচারক যে বিধান দুষ্টের দমনে ব্যস্ত, তাহারাই যে আবার শিষ্টের পালনে তৎপর। যে শাস্ত্র সাধকদের জন্য নানারূপ বিধি-ব্যবস্থা করেন, তাহা যে আবার সিদ্ধ মুক্ত আত্মাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া থাকেন। মার প্রকৃত কাজ শাসন করা নয়, বরং তাহার ঠিক বিপরীত—তাঁহার কাজ আদর করা সোহাগ করা। আমরা আমাদের বুদ্ধির দোষে কর্ম্মের বিপাকে

অমন দয়াময়ী স্নেহময়ী আনন্দময়ী মাকে ঐরূপ ভীষণ-ভাবে সাজাইয়া তুলি। অসাধক মার অনিচ্ছায় মার হাতে জোর করিয়া অসি-মুণ্ড তুলিয়া দেয়, ভক্ত সাধক মার হাত হইতে ঐ সব অস্ত্রশস্ত্র দূরে ফেলিয়া দিয়া তাহার স্থানে মোহন বাঁশী তুলিয়া দিয়া মাকে অনন্ত সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে লাবণ্যে প্রেমরসে পরিপূরিত করিয়া তোলেন। একটু বুঝিতে চেষ্টা কর মা কেন ভীষণরূপে অনুমিতা হন, মা কেন রুদ্ররূপে আবির্ভূতা হন; জন্মমৃত্যু লইয়া মার এমন সুন্দর লীলাখেলাকে আমরা কেন এমন একটা ভয়ের চোখে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছি। সংযমের সাহায্যে সাধনবলে মার ঐ তাণ্ডব-নৃত্যের মধ্যেও তাঁহার শান্ত মুখখানি, মার ঐ জন্মমৃত্যুর পিছনেও অমৃতত্ব-রহস্যটি, মার ঐ রুদ্ররূপের ভিতরেও দক্ষিণ প্রসন্ন মুখখানি সন্দর্শন করিতে চেষ্টা কর; চোখটাকে প্রেম-যমুনার জলে ধুইয়া পরিষ্কার কর, মনটাকে সংস্কারের আবর্জনা হইতে মুক্ত করিয়া চিৎবিভূতিতে বিভূষিত করিয়া তোল, চিত্তকে মার আনন্দ-রসে পরিভাবিত করিয়া দাও; মার কৃপায় যখন তোমার দিব্য-দর্শন খুলিয়া যাইবে তখন দেখিতে পাইবে, মা কত সুন্দরী মা কেমন আনন্দময়ী দয়াময়ী প্রেমময়ী! মায়ের সঙ্গীগণ মায়ের সন্তানগণ তোমার কল্যাণসাধনে আনন্দ-বিধানে কিরূপ তৎপর! তখনই মার সৃষ্টিরহস্য জন্মমৃত্যু-রহস্য সুখদুঃখ-রহস্য প্রাণে প্রাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সৃষ্টির অতীত

দেশে মার অমর আনন্দধামে সর্ব্বদা অবস্থিত থাকিয়া মার লীলার সহায় হইবে, মার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে মার আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতে সক্ষম হইবে। মৃত্যু তখন আর তোমাকে ভয় দেখাইতে সমর্থ হইবে না। মৃত্যুর ভিতর দিয়া মার অভয় কোলে ঢলিয়া পড়িয়া মার আনন্দ-রসে বিভোর থাকাই যে তখন তোমার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে।



মৃত্যু-বিভীষিকা

মনে রাখিতে হইবে, যাঁহারা সমস্ত জীবন ভগবৎভাবে ভাবিত থাকিয়া ভগবৎবিধানে জীবনযাপন করিয়া পরিণত বয়সে উপযুক্ত সময়ে দেহত্যাগ করেন, তাঁহাদের নিকট মৃত্যু একটা যাতনা-প্রদ ভীতিব্যঞ্জক অবস্থা না হইয়া অনেকটা যেন স্বাভাবিক ঘটনাবিশেষে পরিণত হইয়া যায়। মৃত্যুটা তাঁহাদের নিকটে কতকটা ঘুমাইয়া পড়িবার মত,—একটা যেন ঘুমের আবল্যের মধ্য দিয়া নূতন ভাবে নূতন দেশে জাগিয়া উঠিবার মত। স্বাভাবিক মৃত্যুতে যন্ত্রগুলি আপনা হইতে সমস্ত কার্য্যাবসানে শিথিলীভূত হইয়া পড়ে, যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রীর বন্ধন-রজ্জুগুলি আপনা হইতে ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় যন্ত্রত্যাগের সময় যন্ত্রী যেন তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতেও সমর্থ হন না।

মৃত্যুটা যে কাহারও নিকটেই কষ্টপ্রদ নহে একথা আমরা বলিতে ইচ্ছুক নহি, বলাও সঙ্গত মনে করি না; তবে এখানে আমাদিগকে একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে মৃত্যু কেন এত কষ্টপ্রদ, কেন এত ভীষণ মনে হইয়া থাকে। মৃত্যুর অর্থই যখন দেহের সঙ্গে দেহীর যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রীর একটা সম্বন্ধবিচ্ছেদ-বিশেষ, তখন এই উভয়ের মধ্যে আসক্তিটি স্থূলভাবের বন্ধনগুলি যত বেশী শক্ত হইবে, এই বন্ধন দূর করিতে যতটা পরিশ্রম আবশ্যক হইবে, সেই পরিশ্রমের ফলে মৃতকল্প ব্যক্তিকে যে ততটা অধিক কষ্টবোধ করিতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রকৃতিই যে দেহ-দেহীর বন্ধনটা সৃষ্টি করেন ইহা নিঃসন্দেহ। তবে এই বন্ধনসৃষ্টির মধ্যেও যে আমাদের কল্যাণের দিকেই তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে, তাহাতেও আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার এই উদ্দেশ্য যতটা পূর্ণ হইবে, বন্ধনটাও যে আপনা হইতেই ততটা শিথিল হইয়া আসিবে ইহাও ধ্রুব সত্য! বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে স্থূল বন্ধনটা এবং আত্মবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেহাত্মাধ্যাস দূর হওয়ায় সূক্ষ্ম বন্ধনটাও যে আপনা হইতে শিথিল হইয়া যাইতে আরম্ভ করে তাহাও ঠিক। এই জন্যই তো পরিণত বয়সে পরিণত জ্ঞানে স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুর আগমনের মধ্যে আমরা ততটা কষ্টের পরিচয় প্রাপ্ত

হয় না। স্থলবিশেষে পরম জ্ঞানীকেও যে মৃত্যুযাতনা ভোগ করিতে দেখা যায়, তাহার ভিতরে প্রধানতঃ দুইটি কারণ আমরা অনুমান করিবার সুযোগ পাই। প্রথমতঃ, দুঃখ-কষ্টকে—এমন কি, মৃত্যুযাতনাকে পর্য্যন্ত কিভাবে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া মানুষ এই মর-জগতে সাধারণের চোখের সম্মুখেই মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় উপাধি লাভ করিতে পারে, ভগবান তাহার একটা আদর্শ দৃষ্টান্ত এই সব মহাত্মাদের জীবনের ভিতর দিয়া বলিতে প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। যীশুর মৃত্যুর মধ্য দিয়া আমরা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতত্ব লাভ করিবার পথ দেখিতে পাই। দ্বিতীয়তঃ, যে সব মহাত্মাদের প্রায় সমস্ত প্রাক্তন-কর্ম্ম শেষ হইয়া গিয়াছে, যাঁহারা আর জগতে আসিতে ইচ্ছা করেন না, ভগবানের জন্য ভগবৎধামের জন্য যাঁহাদের প্রাণে একটা তীব্র পিপাসার সঞ্চার হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদের সমস্ত দেনা শোধ করিয়া তাঁহাদের সমস্ত ভোগ দূর করিয়া ভগবৎ-বিধানের মর্য্যাদা পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া ভগবান এই মৃত্যুযন্ত্রণার ভিতর দিয়া তাঁহাদের অবশিষ্ট কর্ম্ম শেষ করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার নিজের আনন্দধামে ডাকিয়া লন। অন্যে যে কর্ম্ম পঞ্চাশ বৎসরে সময় সময় দুই-তিন জন্মে শেষ করিত, ইহাঁরা তাহা একমাস দুইমাসের ভিতরে শেষ করিয়া ফেলেন। পৃথিবীর সৃষ্টিতে ইহাঁদের অবস্থা

দেখিয়া ভগবানকে নির্দ্দয় বলিতে ইচ্ছা হইলেও ভক্ত সাধক-গণ ইহার ভিতর দিয়া ভগবৎপ্রেম ভগবৎকৃপা আস্বাদ করিবার বিশেষ সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন।

সাধারণ লোকে যে মৃত্যুকে ভীষণ মনে করে, তাহার কারণ প্রথমতঃ তাহাদের স্বরূপবিস্মৃতি—নিজে কে, কোথা হইতে আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানের অভাব। জীব যদি জানিতে পারে যে সে অমৃতের পুত্র আনন্দময়ের সন্তান ভগবৎ-আনন্দধামই তাহার প্রকৃত বাসস্থান, তাহা হইলে এই অনিত্য দেহকে নিত্য মনে করিয়া একটা কল্পিত দেহাত্মবুদ্ধিতে দেহসর্ব্বস্ব স্থূলসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়া দেহত্যাগকে এইভাবে একটা অস্বাভাবিক অভাব মনে করিয়া এতটা বিচলিত হইয়া পড়িত না। জ্ঞানী কিন্তু মৃত্যুর স্বরূপ জানিয়া আপন স্বরূপে তন্ময় থাকিয়া ভিতরকার আত্মানন্দে এতটা বিভোর থাকেন যে, কখন কি ভাবে মৃত্যু সাধিত হইয়া যায় তাহাও যেন তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত সাধন-ভজনের অভাবে স্থূলের অতীত সূক্ষ্মাবস্থার অনুভূতিলাভে অসমর্থ হইয়া বিকৃত বৌদ্ধ মতের, শূন্যবাদের বিকৃত ব্যাখ্যায় কুসংস্কারাপন্ন হইয়া আমরা মৃত্যুটাকে একেবারে শূন্যে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছি। মৃত্যু যে শুধু পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহকে দেহের সম্বন্ধটাকে নাশ করে, শ্মশানে যে শুধু পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহটাই ভস্মীভূত

হইয়া ছারখার হইয়া যায়, ইহার ভিতরকার সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ যে কর্ম্মফল সহ আত্মার সঙ্গে দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাহা অনুভব করিবার সুযোগ পাইনা বলিয়া এবং সে সম্বন্ধে শাস্ত্রাদির সিদ্ধান্তে বিশ্বাসস্থাপন করিবার শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে মৃত্যুকে সর্ব্বনাশ—একান্তভাবে শূন্যে পরিণতি মনে করিয়া, আমরা দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ি এবং মানসিক সেই ভাবের ফলে স্থূল যাতনাকে খুব বেশী করিয়া অনুভব করিতে আরম্ভ করি। আমরা স্থূলটাকে বেশী ভালবাসিতে গিয়া ভিতরকার ভাবগুলিকে ভাল বাসিতে ভুলিয়া যাই। মানুষের দেহটাকে যত ভালবাসি তাহার ভাবগুলিকে তাহার ভিতরের আত্মাটিকে তত ভাল-বাসিনা, ওসকলের কথা যেন আমাদের মনেও পড়েনা। আমরা বিধানকে ভালবাসিতে ভয় করিতে শিখি না, যাহার ভিতর দিয়া বিধানগুলি প্রকাশ পায় তাহাকে ভক্তি করি বা ভয় করি। ভগবৎবিধানের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া অবতার-বিশেষে ব্যক্তিবিশেষে আসক্ত হইয়া পড়ি, ফলে কল্পিত অবতার বা গুরু দ্বারা প্রতারিত হই। ভিতরের ভাবটাকে একটু ভালবাসিতে শিখিলে তাহার বিকাশের যন্ত্রস্বরূপ দেহটার অভাবে এবং ভিতরকার ভাবের সদ্ভাবের অস্তিত্ব স্মরণ করিয়া কতকটা শান্তিতে থাকিতে পারি।

তৃতীয়তঃ, আমরা একান্তভাবে স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি,

অপরের সুখে দুঃখে সুখী ও দুঃখী হইতে অভ্যস্ত নহি। যে চলিয়া যায় সে তাহার স্বার্থের উপকরণ সুখের সহায় মানুষ ও অন্যান্য দ্রব্যগুলিকে আর দেখিতে পাইবে না, ইহাদের অভাবে কষ্টভোগ করিবে, এই ভয়ে অধীর হইয়া পড়ে; আর যাঁহারা এখানে থাকেন তাঁহারা তাহাকে আর দেখিতে পাইবেন না, সে আর তাঁহাদের কোনও উপকারেই আসিবে না, তাহার সম্বন্ধে সমস্ত আশাভরসা নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে—এই সব ভাবিয়াই তাহার আত্মীয়স্বজন অস্থির হইয়া পড়েন। উভয়দিকের এইজাতীয় ভাবের একটা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে আমরা মৃত্যুকে আরও অনিষ্টপ্রদ মনে করিয়া মৃত্যুযাতনাকে তীব্রতর করিয়া তুলি। আমরা যদি একটু স্বার্থত্যাগে অভ্যস্ত হইতাম তবে বোধ হয় এই-জাতীয় ভাবনা ও কষ্টবোধের পরিমাণটা অনেক কম হইয়া যাইত। আমরা এতই স্বার্থপর যে, আমাদের আত্মীয় আজ সমস্ত দুঃখ-কষ্ট যাতনা-যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া ভগবানের আনন্দধামের আনন্দসুধা আস্বাদনে সক্ষম হইবে, ইহাতে আমরা সুখপ্রকাশ না করিয়া নিজেরা অসুখী হইয়া তাহাকে অসুখী করিয়া তুলি, তাহার আনন্দভোগে বাধা দিয়া থাকি। চতুর্থতঃ, আমরা যে ক্রমে ক্রমে একেবারে স্থূলসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতে বসিয়াছি। স্থূলের পিছনে আর যে কিছু আছে তাহা সময় সময় কথায় বিশ্বাস করিলেও প্রাণে বিশ্বাস

করিতে অভ্যস্ত নহি। স্থূলের শব্দ-স্পর্শাদি স্থূলের সংস্কার স্থূলের ভাবনা-চিন্তাই আমাদের একমাত্র সুখ-শান্তি ও আনন্দের কারণ হইয়া পড়িয়াছে, তাই স্থূলের নাশকেই আমরা একেবারে সর্ব্বনাশ মনে করিয়া একান্ত অধীর হইয়া পড়ি। যে যায় বা যে থাকে তাহারা উভয়েই যদি স্থূলের অতীত সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুভব করিতে, অন্ততঃ তাহাতে প্রাণ হইতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে বোধ হয় মৃত্যু মৃত্যুচিন্তা আমাদিগকে এতটা বিচলিত করিয়া তুলিতে পারিত না। আমাদের এই স্থূলে অত্যাসক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আমাদের চিত্তকে সূক্ষ্মের দিকে চালিত করিয়া সূক্ষ্ম তত্ত্বাস্বাদনের যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্যই তো আমাদের মঙ্গলময় শ্রীভগবান মৃত্যুর মধ্য দিয়া আমাদের কল্যাণসাধনে তৎপর হইয়া পড়েন। 'মিথ্যা জগৎ ভেঙ্গে দেখাও সত্তাশূন্য করে জীবে, তবুও তো সংহারিণী বই দুঃখ-হারিণী বলিনে' গানটি স্মরণ কর।

পঞ্চমতঃ, আমরা ভাবি মৃত্যুতে আমাদের সব সম্বন্ধগুলি ছিন্ন হইয়া যায়, যাহা দেখি যাহা শুনি যাহা দিয়া আনন্দ-লাভ করি তাহার সবই যেন শেষ হইয়া যায়; আর যাহা দেখি না যাহা অনুভব করি না তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমরা অভ্যস্ত নহি, সে সম্বন্ধে সাধনজনিত কোনও অনুভূতিলাভে কখনও সক্ষম হই নাই; তাই তো মৃত্যুকে

একটা অজানার অতল তলে ডুবিয়া যাওয়ার মত মনে করিয়া কেমন একটা হতাশভাবে আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি। সাধক ভক্ত সেই অজানার দেশের কতকটা খবর রাখেন কতকটা খবর পান, সে বিষয়ে তাঁহারা অনেকখানি বিশ্বাসযুক্ত বলিয়া মৃত্যুটাকে অনেকখানি ভাল করিয়া পাওয়ার একটা সুযোগবিশেষ মনে করিয়া মৃত্যু সময়ে এত আনন্দে বিভোর হইয়া পড়েন যে, অনেকে কখন্ মৃত্যু হইল তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। মাতৃভক্ত শিশু সংসারের খেলায় কতকটা ক্লান্ত হইয়া মৃত্যুর ভিতর দিয়া গিয়া মায়ের অভয় কোলে বিশ্রামসুখে বিভোর হইয়া পড়েন। 'দে মা স্থান মা তোর শান্তিনিকেতনে' বলিয়া মৃত্যুকে আনন্দের সহিত বরণ করেন। কবি রবীন্দ্রের গানটি স্মরণ কর।

পার্‌বি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে,
এই খ'সে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙ্‌বারই আনন্দে রে॥
পাতিয়া কান শুনিস্ না যে
দিকে দিকে গগন মাঝে
মরণ-বীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা চন্দ্রেরে
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বল্‌বারই আনন্দে রে॥

পাগল-করা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেই-বা জানে,
চায় না ফিরে পিছন পানে
রয় না বাঁধা বন্ধেরে—
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চলবারই আনন্দে রে ॥
সেই আনন্দ-চরণপাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন ব'হে যায় ধরাতে
বরণ-গীতে গন্ধেরে
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে ॥

আমরা যে-মৃত্যুর নাম স্মরণ করিয়া ভয়ে অস্থির হই, সাধক ভক্ত তাহাকে ভগবানের দান মনে করিয়া তাহার ভিতর দিয়া ভগবৎধামে গিয়া ভগবৎলাভের সম্ভাবনা মনে করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়েন।

আমরা মা প্রকৃতি হইতে অনেকটা বিকৃতির দিকে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের খাওয়াদাওয়া আচার-ব্যবহার ভাবনাচিন্তা সবই যে অনেকটা অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের শিক্ষাদীক্ষা অভ্যাস-সংস্কার সবই যে একান্তভাবে অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে, তাইতো

স্বভাবশিশু ঋষিমুনি সাধকগণ যে-মৃত্যুকে এতটা স্বাভাবিক ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে আমরা একান্তভাবে অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়া মৃত্যুযাতনাকে তীব্রতর মৃত্যু-ভীতিকে অতি ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছি। যাহারা স্বভাবের তালে তালে চলে তাহাদের মৃত্যুটা তত কষ্টকর হয় না, গরীব লোকেরা পশু-পক্ষীগুলি মৃত্যুকে আমাদের মত এতটা ভয় করে না—এমন কি, প্রসবযন্ত্রণায়ও তাহারা আমাদের মত এতটা কষ্ট পায় না। বিকৃত লোকের নিকট প্রকৃতি বিশেষ ভয়াবহ বলিয়া অনুমিত হয়। সাধকগণ জন্মমৃত্যুকে সৃষ্টি ও লয়কে জাগরণ ও নিদ্রাকে প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণতিরূপে গ্রহণ করিয়া আনন্দের সহিত বরণ করিয়া ইহাদের অতীত দেশে চলিয়া যান। কবীন্দ্রের গানটি স্মরণ কর।

কেন রে এই দুয়ার টুকু পার হ'তে সংশয়,
জয় অজানার জয়।
এই দিকে তোর ভরসা যত ঐ দিকে তোর ভয়,
কেন ঐ দিকে তোর ভয় ;
জয় অজানার জয়।
জানা শুনার বাসা বেঁধে, কাট্‌লো তো দিন হেসে কেঁদে,
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয় ;
জয় অজানার জয়।

মরণকে তুই পর করেছিস ভাই—
জীবন যে তোর ক্ষুদ্র হোলো তাই,
দু'দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতই ধরে,
চিরদিনের আবাস খানা সেই কি শূন্যময়!
জয় অজানার জয়।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক শাস্ত্রগুলির ভিতরে নরকবর্ণনা দেখিয়া, নরকে জীব বিশেষতঃ পাপিগণ কি ভাবে ভীষণ যাতনা ভোগ করে তাহার কথা শুনিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে গিয়া আমরা মৃত্যুভয়ে এতটা অস্থির হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। এই নরক-ভীতির ভাবটা আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের একটা অস্বাভাবিক বিকৃত পরিণতি হইতে লাভ করিয়াছি। বুদ্ধের শূন্যবাদ যখন নিরীশ্বর-বাদে নাস্তিকতার চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিল, তখন জীবনটাকে দুঃখভোগের নিদান মনে করিয়া লোকে যাহাতে আত্মহত্যা দ্বারা ভোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে চেষ্টা না করে এবং কর্ম্মবিধানকে অবমাননা করিয়া লোকে যাহাতে ইন্দ্রিয়সুখে রত থাকিতে সচেষ্ট না হয়, সেজন্য পরবর্ত্তী নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্ম নরকের একটা ভীষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়া একটা কল্পিত বালির বাঁধ দিয়া বিকৃতির মুখে ধাবমান জীবকে রক্ষা করিবার বৃথা প্রয়াস পাইয়াছিল। প্রাচীন বৈদিক-শাস্ত্র পরলোকে সুখের লোভ দেখাইয়া

লোককে সুপথে চালিত করিতে বিশেষ সচেষ্ট থাকিলেও তাহার ভিতরে বিশেষ কোন অস্বাভাবিক বর্ণনার ভাব পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার পরে ফলপ্রাপ্তির একটা অস্বাভাবিক বাড়াবাড়ির মধ্য দিয়া মানুষকে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে গিয়া সময় সময় আপন আপন প্রতিষ্ঠা অক্ষত রাখিবার জন্যও কতকটা অস্বাভাবিক ভাবে নরকের ভয় দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, যাঁহারা ভগবানকে সাধনার ফলে কতকটা আস্বাদ্য করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, ভগবানের কল্যাণকর আনন্দপ্রদ অমোঘ বিধানগুলির রহস্য কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারা শ্রীভগবানকে দয়াময় প্রেমময় মঙ্গলময় জীবহিতে রত ছাড়া অন্য ভাবে কল্পনা করিতেও সক্ষম নহে। নরকের ভয়টা যে ভগবানে বিশ্বাসের অভাব হইতে, নাস্তিকতার একটা অস্বাভাবিক প্রভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ; নতুবা আস্তিকের নিকট জগৎটা সৃষ্ট হইয়াছে ভগবানকে প্রকাশ করিবার জন্য। জীবদুঃখে ভগবানের কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাই জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া ভগবান মানুষকে পবিত্র করিয়া যোগ্য করিয়া পূর্ণ করিয়া তাঁহার পরমানন্দ আস্বাদনে সমর্থন করিয়া থাকেন। সাধকের নিকট মৃত্যু মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়া। স্বাভাবিক ভাবের মৃত্যুতে বিশেষ কষ্টভোগের কোনও কারণ নাই। পরলোকের সুখস্পৃহা, একটা

অনাবিল আনন্দের আশা। মৃত্যুর সাময়িক দুঃখকে বরং তুচ্ছ করিতে অগ্রাহ্য করিতেই শিক্ষা দিয়া থাকে।

জ্ঞানীর নিকট জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই শ্রীভগবানের লীলার সহায়, খেলার অঙ্গবিশেষ। জন্মমৃত্যুটা একটা কাপড় বদলানর মত, জাগরণ ও ঘুমের তুল্য। জ্ঞানীর কিন্তু মৃত্যুতে স্মৃতিলোপ পায় না, ব্যষ্টি-সমষ্টি প্রকৃতির কোন কাজেই জ্ঞানী বাধা দেন না বলিয়া তাঁহার নিকট প্রকৃতির কোন তত্ত্বই অজ্ঞাত থাকে না। ঋষিগণ সাধকগণ দেখাইয়া গিয়াছেন জন্মমৃত্যুকে কি ভাবে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় উপাধি লাভ করা যায়। মৃত্যুকে যখন জয় করা যায়, স্বভাবস্থিত প্রকৃতির নগ্ন শিশুকল্প সংস্কার-বর্জ্জিত সাধকগণ যখন মৃত্যুকে জয় করিতে মৃত্যুসাগর পার হইতে সক্ষম, তখন মৃত্যুভয়কে একটা আগন্তুক উপধর্ম্ম ছাড়া স্বভাবসিদ্ধ কি করিয়া বলা যাইতে পারে? বিকৃতি ব্যাধি অস্বাভাবিকতাই তো যত দুঃখের কারণ। সংযত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া জ্ঞানের অনুশীলন ও সূক্ষ্মদর্শন দ্বারা দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ভগবৎবিধানগুলি অবগত হইয়া তাহার তালে তালে জীবন চালাইতে পারিলে যে মৃত্যুর তীব্রতা কমিয়া যায়, পরিশেষে মৃত্যুকে জয় করিয়া শিবত্ব লাভ করা যায়, তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। প্রাচীন ঋষিদের সমস্ত সাধনভজনের উদ্দেশ্যই ছিল এই মৃত্যুকে জয় করিয়া অমৃতত্বকে আস্বাদ করিবার চেষ্টা করা।



তত্ত্ববিচার

জন্মমৃত্যু-রহস্যটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে মানুষের মধ্যে কি কি তত্ত্ব আছে এবং তাহার মধ্যে কোনগুলি নিত্য স্থায়ী অপরিবর্ত্তনীয় এবং কোনগুলিই বা পরিবর্ত্তনীয় বিনাশশীল এবং তাহাদের পরিবর্ত্তন বা বিনাশ কি প্রণালীতে সাধিত হইয়া থাকে, তাহা একটু বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। আমরা অনেকটা স্থূল-ভাবে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের বিজ্ঞান-শাস্ত্র পর্য্যন্ত জড়পদার্থের স্তরগুলি ভেদ করিয়া সূক্ষ্মতত্ত্বে গিয়া পৌঁছিতে এখনও সমর্থ হয় নাই। যাহা স্থূলদৃষ্টির স্থূল অনুভূতির অবিষয়ীভূত তাহাকে স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা, স্থূল অনুভূতি হইতে উৎপন্ন অনুমান করিতে যাওয়া, তর্ক-বিচার দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ

নহে। এইজন্যই ঋষিগণ বলিয়া থাকেন, যাহা অচিন্ত্য তাহা লইয়া তর্ক করিতে যাইও না 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ'। এবিষয়ে সমস্ত দেশেই আর্ষ-শাস্ত্রকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে—যেমন বেদ হিন্দু-দের, কোরাণ মুসলমানদের, বাইবেল খ্রীষ্টানদের। তবে ইহাও বলা হইয়াছে, ঐ সব তত্ত্বগুলি বিচারলভ্য না হইলেও সাধন-বেদ্য। যেখানে বাক্য মনের সহিত না পাইয়া ফিরিয়া আইসে 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' সেখানেও বিদ্বান সাধক ব্রহ্মের আনন্দরূপ দর্শন করিয়া অভয়প্রতিষ্ঠা লাভ করেন 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন'। বুদ্ধির অনধিগম্য তত্ত্বও যে সূক্ষ্ম-বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা আস্বাদ্য, তাহার বেশ সুন্দর একটা আভাস ইহাতে প্রদান করা হইয়াছে। বিজ্ঞান-শাস্ত্রও যে আস্তে আস্তে আত্মতত্ত্বে সূক্ষ্মতত্ত্বে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতেও আমাদের সন্দেহ নাই। আমাদের বিশ্বাস, বিজ্ঞানের গতি এইভাবে চলিতে থাকিলে আমরা শীঘ্রই বিজ্ঞানের সাহায্যে আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইব; বৈজ্ঞানিকগণই প্রকৃত সাধনতত্ত্ব সুন্দরভাবে অবগত হইয়া সাধনভজনকে ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্ণতালাভের সরল সুন্দর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া সাধন-রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে সচেষ্ট ও সক্ষম হইয়া

পড়িবেন। বলা বাহুল্য, প্রায় সমস্ত দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রই দেহাতিরিক্ত দেহমধ্যে অবস্থিত অনুপ্রবিষ্ট অনুস্যূত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। সকলেব মতেই আত্মা নিত্য শাশ্বত অবিকারী সনাতন তত্ত্ব-বিশেষ। হিন্দুদের মধ্যে গীতা সর্ব্বজন-পরিচিত। এই গীতার মধ্যে আত্মাকে অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য নিত্য সর্ব্বগত স্থাণু অচল সনাতন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে; আর দেহকে বিনাশশীল অন্তবন্ত বস্ত্রাদির ন্যায় গ্রাহ্য ও ত্যাজ্যভাবে বিকারী ক্ষয়-বৃদ্ধিশীল বলা হইয়াছে। আত্মা দেহকে গ্রহণ করে নিজকে আস্বাদ করিবার জন্য প্রকাশ করিবার জন্য প্রচার করিবার জন্য। এক দেহের প্রয়োজন সাধন হইয়া গেলে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় তাহা ত্যাগ করিয়া আত্মা অন্য দেহ গ্রহণ করে। এখানে বলা দরকার যে আমরা বাইবেল ও কোরাণের মধ্যেও পুনর্জ্জন্মের উল্লেখ দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছি। এই দেহে যেমন কৌমার যৌবন ও জরা দৃষ্ট হয়, দেহান্তর-প্রাপ্তিও সেইজাতীয় একটা অবস্থাবিশেষ মনে করিতে হইবে। জাত ব্যক্তিরই যেমন মরণ অনিবার্য্য, সেইরূপ কৈবল্য মুক্তিলাভের পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তিরও দেহান্তর-প্রাপ্তি ধ্রুব সত্য। দর্শন-শাস্ত্রগুলি জীবাত্মার আত্মার নিত্যত্ব দেখাইয়া তাহার পরে ত্রিবিধ-দেহের পঞ্চকোশের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ আত্মার

আবরণরূপে মূর্ত্তিরূপে গৃহীত পরিণতিপ্রাপ্ত বা বিবর্ত্তিত। আমাদের মৃত্যুর সময় কেবল ক্ষিতি ও অপ্‌তত্ত্ব-প্রধান স্থূল দেহটিই বিনষ্ট হইয়া যায়। যে যে-তত্ত্ব সে তাহার উপরের তত্ত্বকে বিনাশ করিতে সক্ষম নহে, কারণ বিনাশ-শব্দের অর্থই কারণে লয় হওয়া। অগ্নির প্রভাব ক্ষিতি ও অপ্‌তত্ত্ব পর্য্যন্তই বিশেষভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই যে গরম বায়ু তাপ দেয়, সেখানেও এই পঞ্চীকৃত বায়ুতত্ত্বের ক্ষিতি ও অপের ভিতরকার অংশই উষ্ণ হইয়া তাপ প্রদান করিয়া থাকে। শরীর এই সব তত্ত্বের পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত—ইহারা সকলেই অন্তরস্থ আত্মা দ্বারা পরিভাবিত আত্মশক্তি দ্বারা পরিচালিত। তমোগুণ তামসিক ভাব এই আত্মপ্রকাশে বাধা দেয়, সত্ত্বগুণ সাত্ত্বিক ভাব আত্মপ্রকাশের সহায় হয়। মানুষ যতই সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন হইতে থাকে ততই সে আত্মভাবাপন্ন হইয়া আত্মার স্বরূপদর্শনে আপনাকে অজর অমর আত্মা মনে করিয়া জন্মমৃত্যুর পরপারে যাইয়া অমৃত-তত্ত্ব আস্বাদনে সমর্থ হয়। যাহারা ঘোর তমোভাবাপন্ন তাহাদের সূক্ষ্ম ও কারণ-তত্ত্ব বিকাশপ্রাপ্ত হয় না, আত্মভাবে ভাবিত থাকে না; তাহারা অনেকটা জড়পদার্থ তুল্য। যে পর্য্যন্ত দেহাত্ম-বুদ্ধি দেহাত্মাধ্যাস দূর না হইবে সে পর্য্যন্ত মুক্তিলাভ অসম্ভব। জ্ঞানী সাধক বিচার দ্বারা সাধনা দ্বারা তাহাদের দেহগুলিকে আত্মভাবে ভাবিত করিয়া ভাবিত দেখিয়া

দেহাত্মভাব দূর করিতে সক্ষম হন। সাধারণ লোকের মৃত্যুতে শুধু স্থূল দেহটিই ত্যাগ করা হইয়া থাকে; জ্ঞানী সাধকের বিশেষতঃ সিদ্ধ-মহাত্মাদের মৃত্যুতে ত্রিবিধ দেহই ত্যক্ত হইয়া কৈবল্য মুক্তিলাভের উপযুক্ত হয়। আমাদের যত কামনা-বাসনা আসক্তি-সংস্কার ইচ্ছা-অনিচ্ছা হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি, ইহারা সব মনের ধর্ম্ম সূক্ষ্মদেহে বাস করে; সুতরাং স্থূলদেহ ত্যাগ করায় ইহাদিগকে ত্যাগ করা হয় না। আমাদের আত্মার উপরে পাঁচটি আবরণ বা কোশ রহিয়াছে—যথা অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। অন্নময়-কোশটিই আমাদের এই স্থূলদেহ, প্রাণময় কোশটি আমাদের জীবনীশক্তি কার্য্য-করণসামর্থ্য প্রদান করে, মনোময় সঙ্কল্প-বিকল্প করে, বিজ্ঞানময় বিচার করে, আনন্দময় আনন্দ দান করে আনন্দ আস্বাদ করে। সাধারণ মৃত্যুতে শুধু অন্নময়-কোশটিই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। বাকী কোশগুলি পূর্ব্বের ন্যায় থাকিয়া যায় পূর্ব্বের ন্যায় কাজ করিতে থাকে, তবে অন্নময়-কোশের সাহায্যে যে কাজগুলি সাধিত হইত সেগুলি সম্পাদন করিতে বাধা পাইয়া থাকে। মানুষ সাধনার রাজ্যে জীবনগঠনে ভগবৎইচ্ছাপূরণে যত সামর্থ্য লাভ করে, তাহাদের প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় কোশ-গুলিও তত স্বচ্ছ ভগবৎভাবে ভাবিত আনন্দলাভে আনন্দ-

দানে সক্ষম হইয়া উঠে। সুতরাং দেহান্তে স্থূল-দেহত্যাগের পরে কে কিভাবে অবস্থান করিবে কে কিভাবে কাজ করিবে, তাহা তাহাদের সাধনরাজ্যের প্রকৃত অধিকারের উপর নির্ভর করে। এখানে সাধন-শব্দ জীবনগঠনের উন্নতিবিধানের পূর্ণতালাভের ভগবৎভাবে ভাবিত হওয়ার ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়রূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানী পরোপকারী সংযত সাধনপর ভগবৎভক্ত সাধক যে মৃত্যুর পরে সদ্গতি লাভ করিবে আনন্দভোগে আনন্দদানে সক্ষম হইবে এবং অজ্ঞানী অসংযত হিংসুক পরদ্রোহী ব্যক্তিগণ যে মৃত্যুর পরে সদ্গতিলাভে বঞ্চিত হইয়া কষ্ট পাইবে, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কোনও কারণই থাকা উচিত নহে। দেহান্তে সাধুগণ স্বর্গে যান, অসাধুগণ নরকে গিয়া দুঃখকষ্ট ভোগ করে। বিষ্ণুপুরাণ বলেন 'মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্‌বিপর্য্যয়ঃ'। মনের প্রীতিকর অবস্থা বা যেখানে যে লোকে গেলে মন আনন্দ-লাভে সক্ষম হয় তাহাই স্বর্গ; এবং মনের অতৃপ্তিকর অবস্থা বা যেখানে গেলে মন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে তাহাই যে নরক, তাহাতে আমাদের সন্দেহ থাকা উচিত নহে। গীতায়ও দেখিতে পাওয়া যায় 'ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং' কাম ক্রোধ ও লোভই নরকের ত্রিবিধ দ্বার; ইহারা আত্মার প্রকাশে বাধা দিয়া থাকে, সেজন্য ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে চেষ্টা

করা উচিত অর্থাৎ কাম ক্রোধ ও লোভরূপ রিপুগুলিকে সংযত রাখা আবশ্যক। যাহারা একাজে সক্ষম হয় তাহারা দেহান্তে স্বর্গে যায়, যাহারা একাজে পরাঙ্মুখ তাহারা দেহান্তে নরকে গিয়া দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। তাহার পরে 'নর' শব্দের উত্তর অল্পার্থে ক-প্রত্যয় করিয়া নরক-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; সুতরাং নরক অর্থই মানুষের অপূর্ণ অবস্থা অসিদ্ধ অবস্থা, অতএব নরকে যে শান্তি নাই তাহা ধ্রুব সত্য।

ভগবানের বিধান তাঁহার কার্য্যকারণ-রহস্য তাঁহার কর্ম্ম-ফলতত্ত্ব যখন অমোঘ অপরিবর্ত্তনীয়, তখন যে ভাললোক সুখভোগ করিবে মন্দলোক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তবে সেই ভগবৎ-বিধানের সাহায্যেই ভগবান যে শাসনকে শোধনের উন্নতি-লাভের ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় করিয়া রাখিয়াছেন, সে তত্ত্বটি সকলে সব সময় ঠিকভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তাঁহার শাসন যে মায়ের শাসন অপেক্ষা কোটিগুণ কোমল ও মধুর ভক্তসাধক ছাড়া অন্যে তাহা কি করিয়া বুঝিবে ? তাঁহার বিধানগুলি যে তাঁহার দয়ার তাঁহার প্রেমের মহিমাই ঘোষণা করিয়া থাকে। যাহারা হিংসা দ্বেষ ক্রোধ আদি দ্বারা চালিত হইয়া কাহাকেও শাসন করিতে যায়, তাহারা তাঁহার শাসন-রহস্য প্রেম-রহস্য আর কি করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবে ? পুরাণপাঠে অবগত হওয়া যায় কোনও

জীব, এমন কি কোন পাপাত্মাও যখন দেহত্যাগ করে শ্রীভগবান তখন চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহার জীবনে এমন কোন পুণ্যকাজ দেখা যায় কি না যাহা অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুদূত গিয়া তাহাকে স্বর্গে লইয়া আসিতে পারে। একবার কোনও মতে বিধান অমান্য না করিয়া স্বর্গে আনিয়া ফেলিতে পারিলে সেখানকার পবিত্র হাওয়ায় সাধুসঙ্গপ্রভাবে হয়তো তাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া যাইবে। তিনি যে কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারেন না। আমরা যে তাঁহার অতি আদরের ধন! মা কি ছেলেমেয়ের উপর রাগ করিতে পারেন? কু-পুত্রই ত মার কৃপা বিশেষ করিয়া আকর্ষণ করিয়া থাকে। তিনি যে দীনবন্ধু, তাঁহার প্রিয় জীব কষ্ট পাইবে তাহা তিনি কি করিয়া সহ্য করিবেন? 'জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদরিয়া যায়' ইহা যে তাঁহারই অবতারবিশেষের কথা। তাঁহার বিধানগুলি তাঁহার প্রকৃতি তাঁহার অবতার তাঁহার ভক্ত সাধকগণ যে কি ভাবে তাঁহার জীবের দুঃখে অস্থির হইয়া পড়ে, জীবকে সুপথে লইয়া যাইতে জীবের কল্যাণসাধনে জীবের আনন্দ-বিধানে তৎপর হয়, তাহা সাধক ভক্ত ছাড়া অন্যের পক্ষে বুঝিয়া উঠা তত সহজ নহে। তাঁহার বিধানের লক্ষ্যটি তাঁহার 'পরাণের আশাগুলি' তাঁহার হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলির দিকে দৃষ্টি না রাখার ফলেই তো আমরা নরককে এতটা

ভীতিপ্রদ বীভৎস ভাবে বর্ণনা করিতে পারিয়াছি। মানুষকে সাবধান করিতে গিয়া প্রকৃত তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া আমরা যেমন নরককে অতিরঞ্জিতভাবে বর্ণনা করিতে গিয়াছি, ঠিক তেমনি পরলোকের প্রকৃত অবস্থাটা না বুঝিয়া ভূত-প্রেততত্ত্বকে না জানিয়া এইগুলিকে এমন-ভাবে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে খারাপ লোক এখানে যে ভাবে মানসিক অশান্তি ভোগ করে, ওখানে গিয়া তদপেক্ষা বেশী অশান্তি ভোগ করে না; তবে এখানে যেমন বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য স্থূল উপকরণগুলি রহিয়াছে, সেখানে সেইরূপ স্থূল উপকরণের অসদ্ভাব হেতু স্থূলভাবাপন্ন তামসিক আত্মার পক্ষে ওসব ভোগ করাটা তত সহজ বলিয়া মনে হয় না। তার পরে সুখদুঃখ একটা তুলনাত্মক বৃত্তিবিশেষ। যাহা তোমার সুখ-দুঃখের কারণ তাহা যে আমারও সুখ-দুঃখের কারণ হইবে, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে তাহার উপরের ভাব বা কাজ তাহার পক্ষে কল্যাণপ্রদ ও আনন্দদায়ক, তাহার নীচের ভাব বা কাজ অকল্যাণপ্রদ ও কষ্টদায়ক। মেথর পায়খানার দুর্গন্ধ টের পায় না—সাধু একটা কাজকে যতটা পাপের কারণ মনে করেন, অসাধু তাহাকে ততটা পাপের কারণ মনে করেন না। অসাধুর পারলৌকিক, এমন কি ইহলৌকিক ভাব বা অবস্থা সাধুর

নিকট যতটা দুঃসহ ও কষ্টকর মনে হয়, অসাধুর ততটা মনে হয় না। সাধারণ লোক যাহারা বিশেষ মারাত্মক কোনও অন্যায় কাজ করে না অন্যায় কাজ করিতে অভ্যস্ত নহে, তাহারা মৃত্যুর পরপারে গিয়া যে এখানকার অপেক্ষা বেশী শান্তিপ্রদ অবস্থায় থাকিয়া সমধিক আনন্দভোগে সক্ষম হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভূত-প্রেত সম্বন্ধে আমরা অতি বিশ্রী একটা ধারণা পোষণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ভূত-প্রেত বলিলেই আমরা খারাপ আত্মা পাপীর সূক্ষ্মদেহ অনুমান করিতে বসি। প্রকৃতপক্ষে ভূত-শব্দের অর্থ অতীত, প্রেত শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে গত। যাঁহারা সংসার হইতে পৃথিবী হইতে চলিয়া গিয়াছেন স্থূলদৃষ্টির অবিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারাই যে ভূত তাঁহারাই যে প্রেত। এই ভূত-প্রেতের মধ্যে ভাললোকও আছেন মন্দলোকও আছেন। ভাল ভাল ভূত-প্রেতগুলি যে জীবের কল্যাণ-সাধনে তৎপর থাকেন তাহা আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না। খারাপ ভূত-প্রেতগুলিও যে তেমনি লোকের অনিষ্টসাধনে ব্যস্ত হন, সূক্ষ্মদেহে গিয়াও হিংসাপ্রবৃত্তি ভুলিতে সক্ষম হন না, তাহা সত্য হইলেও সেখানকার হাওয়ার গুণে ভগবানের মঙ্গলময় বিধানের ফলে সেখানে যে তাহাদের ভাল হইবার ক্রমোন্নতিলাভের বিশেষ

সম্ভাবনা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রের সাধারণ ব্যবস্থা প্রেতলোকে প্রত্যেক আত্মাকে সূক্ষ্মদেহধারী জীবকে একবৎসর বাস করিতে হইবে। ইহার মধ্যেও বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারে মুক্ত সাধু ব্যক্তির আত্মা প্রেতলোকে এক বৎসরই বাস করিবে এবং অসাধুর আত্মা এক বৎসরের মধ্যেই প্রেতলোক ত্যাগ করিতে সক্ষম হইবে, এমন কোনও বিধান কল্পনা করা যায় না। ভাল আত্মার প্রেতলোকে বাস সুখভোগের জন্য স্বর্গসুখ আস্বাদ করিবার জন্য, খারাপ আত্মার প্রেতলোকে বাস নরক-যন্ত্রণা ভোগের জন্য। প্রেত-লোকবাসী আত্মার সূক্ষ্মদেহের কল্যাণের সহায় হইবার জন্য শাস্ত্র শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি দিয়া থাকেন। সূক্ষ্মদেহের কাজগুলি প্রেতলোকে চলিতে থাকে। সাধুর সূক্ষ্মদেহ সেখানে গিয়াও লোকের কল্যাণসাধনে নিরত থাকে, আর অসাধুর সূক্ষ্মদেহ অসাধু কল্পনাজল্পনা লইয়া বিব্রত হয়।

বৈজ্ঞানিকের নিকট ভূততত্ত্ব কি ভাবে গৃহীত হওয়া উচিত, তাহাও একটু ভাবিয়া দেখা যাউক। আজকাল এমন অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা একটা কিছু বৈজ্ঞানিক প্রমাণ না পাইলে কিছুই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হন না। বিজ্ঞান-শাস্ত্রকে আমরাও যথেষ্ট ভক্তি করি। বিজ্ঞান-শাস্ত্রের উন্নতি যে ব্যক্তিগত সমাজগত সাধনগত

জীবনে একান্ত আবশ্যক তাহা স্বীকার করিলেও বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ পরিণতিকে অসীম মনে করিয়া বঞ্চিত হইতে আমরা প্রস্তুত নহি। যে সমস্ত বিষয় লইয়া আমাদের বাস করিতে হয় তাহার কোনগুলি সম্বন্ধে বিজ্ঞান কত দূর সত্যনির্দ্ধারণে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাও একটু ভাবিয়া দেখা উচিত। আমাদিগকে যে অনেক কাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশেষ কোনও সম্বন্ধ না রাখিয়া অনুষ্ঠান করিয়া যাইতে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সব তত্ত্ব আমাদের জীবনগঠনের উন্নতিসাধনের বিশেষ অনুকূল, যাহার সাহায্যে আমাদের জীবনের অনেক কঠিন সমস্যা সহজে মীমাংসিত হইয়া যায়, যাহার সত্যতা সম্বন্ধে তত্ত্বদর্শী ঋষি-মুনিগণ সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন, যাহার উল্লেখ আমরা প্রায় সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে পাই, সেই সব তত্ত্বকে বর্ত্তমান সীমাবদ্ধ বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাহির বলিয়া একেবারে বিচার না করিয়া অগ্রাহ্য করিতে যাওয়া কল্পনা বলিয়া নিন্দা করিতে যাওয়া কোনও মতেই জ্ঞানীর কার্য্য বলিয়া মনে হয় না। প্রায় সমস্ত বিষয়েই প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানের মত যে কিভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা ভাবিলে বিজ্ঞানকে যে প্রকৃত জ্ঞানরূপে গ্রহণ করাও কঠিন হইয়া পড়ে। রেডিয়ামের (Radium) আবিষ্কারের পরে এই অল্পদিনের মধ্যে মূল ভূত সম্বন্ধে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তগুলি

বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে বসিয়াছে। পরমাণুকে আর বুঝি অনাদি অনন্তরূপে গ্রহণ করিতে গেলে চলে না। এতদিন পর্য্যন্ত যে বিজ্ঞান বোধশক্তি বিচারশক্তিকে শুধু মনুষ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া নিম্নশ্রেণীর জন্তুগণকে পর্য্যন্ত মনোহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিতেছিলেন, আজ যে সেই বিজ্ঞান গাছপাতার ভিতরে পর্য্যন্ত বোধশক্তির বিচারশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া প্রাচীন ঋষিদের আত্মার সর্ব্বগত ভাব উপলব্ধির অনেকটা নিকটে আসিয়া পড়িয়াছেন। আজ যে অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত যন্ত্রের সাহায্যে রসায়ন-বিদ্যার সাহায্যে প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন যে, ঘাসের এবং বাঁশের নারিকেল সুপারী ও তালের কীটপতঙ্গ সরীসৃপ কুকুর বিড়াল হাতী, এমন কি মানুষের পর্য্যন্ত মূল উপাদান বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। কেহ কেহ এ পর্য্যন্তও বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে সমস্ত জীবই এক আদি বীজ হইতে উৎপন্ন। ইহার মধ্যে আমরা বৈজ্ঞানিকদের মতগুলির ঘোর পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া উন্নত প্রাচীন ঋষিগণের আবিষ্কৃত সত্যের নিকট আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়ার ভাবই দেখিতে পাই। একদিন হয়তো বিজ্ঞান মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, একই অনন্তরূপে বিকাশপ্রাপ্ত পরিণত বা বিবর্ত্তিত হয়। 'একোঽহং বহুঃ স্যাম্' এই শ্রুতিটি বোধ হয় একদিন

বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবে। তবে এখন পর্য্যন্ত বিজ্ঞান অনেকটা স্থূলতত্ত্বে সীমাবদ্ধ; ভিতরকার সূক্ষ্ম ও কারণ-তত্ত্বের মধ্যে যে সব রহস্য লুক্কায়িত আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে বিজ্ঞানের অনেকটা সময় লাগাই যে স্বাভাবিক। আত্মার নিত্যত্ব এবং আত্মার ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব লইয়া বৈজ্ঞানিকগণ মহা সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছেন। ডারবিন (Darwin) প্রমুখ পণ্ডিতগণ ক্রমবিকাশ-তত্ত্বকে যেভাবে জড়ত্বে সীমাবদ্ধ করিয়া জড়কেই আত্মার উৎপাদক পিতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুবিখ্যাত জার্ম্মান পণ্ডিতগণ আজ তাহা বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়া ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের ভিতরে আত্মারই (Spirits) বিকাশ-তত্ত্ব প্রমাণ করিতে বিশেষভাবে সচেষ্ট, অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়া উঠিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ বলেন আত্মা সর্ব্বব্যাপী, আত্মা সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বভূতের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করিতেছেন। জড়দেহ আত্মারই সান্নিধ্যে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতির ন্যায় পঙ্গু-অন্ধবৎ সৃষ্টি-কার্য্যের পরিণতিলাভের সহায় হন। জড়দেহের মধ্যে আত্মা নিত্য বর্ত্তমান, আমাদের বোধশক্তি তাহা অনুভব করিতে অসমর্থ। জড়দেহের পরিণতির মধ্যে এমন একটা অবস্থা উপস্থিত হয়, যখন আমরা তাহার ভিতরকার আত্মতত্ত্ব প্রাণ মন বুদ্ধি আদির ভিতর দিয়া উপলব্ধি

করিতে সক্ষম হই। অজ্ঞানিগণ আমাদের এই উপলব্ধির প্রারম্ভকেই ঐ সমস্ত মানসিক বৃত্তির সৃষ্টি মনে করিয়া মনকে আত্মাকে জড়োৎপন্ন বলিয়া ঘোষণা করিতে ব্যস্ত হন। জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানের দ্বিবিধ মত সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। নিম্নস্তরের এককোষ (protozoa) জীবগুলির ভিতরে স্ত্রী-পুরুষভেদ নাই, উহাদের দেহাংশ হইতেই নাকি উহাদের বংশধরগণ জন্মলাভ করে। উহাদের উৎপত্তিকে অনেকটা অযোনি-সম্ভব-সৃষ্টি (non-sexual generation) বলা হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু সেখানেও পুংশক্তি ও স্ত্রীশক্তির মিলন-তত্ত্ব কল্পনা করিতে পশ্চাৎপদ হই না। উচ্চস্তরের বহুকোষ (metazoa) জীবগুলির উৎপত্তি যৌনপদ্ধতি (sexual generation) অনুসারে সাধিত হইয়া থাকে। পুরুষের শুক্রবীজ ও স্ত্রীজাতির ডিম্বকোষ-তত্ত্ব লইয়া বিচার করিতে গিয়া জড়বাদিগণ বলিয়া থাকেন যে, দুইটি স্বতন্ত্র কৌষিক আত্মার (cell soul) মিলনে জীবাত্মার উদ্ভব হয়—ইহাদের উভয় বীজকেই জীবিত অবস্থায় পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইতে দেখা যায়। দুইটির মিলনে যাহা উৎপন্ন তাহাকে কি করিয়া নিত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে ? সুতরাং একই আত্মা যে আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াছে, হিন্দুদের এই মত একান্তভাবে অগ্রাহ্য।

এ বিষয়ে হিন্দুদের অনুভূতি অন্যরূপ। সাংখ্যদর্শনের সৃষ্টিতত্ত্বে পুরুষপ্রকৃতির মিলনে যেভাবে জগৎসৃষ্টি দেখান হইয়াছে, জীবদেহের সৃষ্টিব্যাপারেও ঠিক সেইরূপ ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাঁহারা বলেন, শুক্র-শোণিতের মিলন জীবাত্মার ভ্রূণরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইবার জন্য একান্ত আবশ্যক। ইহার মধ্যে মাতৃ-গর্ভস্থ কোষ শুধু দেহসৃষ্টির একটা উপাদান-কারণ মাত্র। জীবাত্মা দেহান্তে পুরুষদেহে শুক্রবীজরূপে আবির্ভূত হয়। ডিম্বকোষের গতি চুম্বকসংসর্গে লৌহের গতির ন্যায় একটা আরোপিত ধর্ম্মমাত্র। তারপরে হিন্দুমতে আত্মা ও প্রাণ একপদার্থ নহে। সমস্ত জীবদেহে যে-সমস্ত সজীব জৈব উপাদান বর্ত্তমান থাকে, জননীজঠরে তাহাই জীবাত্মার পুরুষদেহ হইতে আগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। বাস্তবিকই জীবের উৎপত্তিপ্রকরণ যেন মহামায়ার একটা কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। বড় বড় বৈজ্ঞানিক দার্শনিকগণ এই তত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। জড়দেহের পরিণতির মাঝখানে কোথায় কেন যে মনস্তত্ত্ব কি ভাবে বিকাশ পায়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা ঠিকভাবে দেখাইতে সক্ষম হন নাই। মন আত্মা আদি পূর্ব্বে অদৃশ্য (latent) ভাবে ছিল, এখন অনুকূল অবস্থা পাইয়া বিকাশ পাইল অনুভব-বেদ্য (patent) হইল,

এই তত্ত্বই তো সমীচীন বলিয়া মনে হয়। নতুবা কিছু না হইতে একটা কিছুর উৎপত্তি অনাত্ম-ধর্ম্মাত্মক জড় হইতে আত্মার উৎপত্তি গায়ের জোরে প্রমাণ করিতে গিয়া আমরা যে সৃষ্টিরহস্যকে আরও প্রহেলিকাপূর্ণ কুয়াশাবৃত করিয়া তুলি। বিজ্ঞান যাহার বলে আত্মার নিত্যত্ব অস্বীকার করিতে সচেষ্ট, সেই সব যুক্তি অপেক্ষা আত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রের যুক্তিগুলি যে বিশেষভাবে সন্তোষজনক ও হৃদ্য তাহাতে বোধ হয় কেহই সন্দেহ করিতে পারেন না। শাস্ত্রীয় যুক্তিগুলি গ্রহণ করিতে পারিলে যে অনেক তত্ত্বই সুন্দররূপে মীমাংসিত হইয়া যায় তাহা নিঃসন্দেহ। প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত করিতে না পারিয়া কোনও জিনিসকে বৈজ্ঞানিক বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে যে বিজ্ঞান-শাস্ত্রকেই অবমাননা করা হয় তাহাও আমরা বেশ বুঝিতে পারি। এ অবস্থায় বিজ্ঞান যদি গায়ের জোরে সব অস্বীকার করিতে না গিয়া এসব তত্ত্ব এখনও বৈজ্ঞানিক ভাবে অনাবিষ্কৃত বলেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকা উচিত নয়। তবে যাঁহারা বিজ্ঞানের দুই পাতা পড়িয়া অপরিমার্জিত বিচার-বুদ্ধি দিয়াই অসাধক অবিশ্বাসীদের দুইএকটা কথা শুনিয়াই প্রাচীন ঋষিদের প্রত্যক্ষীভূত সত্য-গুলিকে অবহেলায় অস্বীকার করিতে যান, তাঁহাদের মানসিক পরিণতি যে বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ তাহা না ভাবিয়া

না বলিয়া থাকা কঠিন হইয়া পড়ে। শাস্ত্রের কোনও তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব না, সাধকদের সিদ্ধদেহের সৎসঙ্গলাভে বঞ্চিত রহিব, শুধু দুই-এক জন অসাধক ব্যবহারিক জীবের দু'একটা মৌখিক কথা শুনিয়া তাহাদের অগম্য পারমার্থিক সাধনবেদ্য তত্ত্বগুলিকে গায়ের জোরে অস্বীকার করিতে যাইব, ইহা যে বড়ই স্পর্দ্ধার কথা। জ্ঞানের রাজ্যে ইহাদের স্থান অতি নিম্নস্তরেই নির্দ্দেশ করা বুদ্ধির পরিচায়ক।



মৃত্যুর সময় একটু আগে বা পরে সেই মৃতকল্প বা মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্ম আত্মা তাহার আত্মীয়স্বজনের নিকটে গিয়া স্বপ্নে বা ছায়াদেহে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে দেখিতে তাহাদের নিকট হইতে ইহজীবনের শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে যে কিভাবে চেষ্টা করে, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেক সময় আত্মীয়স্বজন হঠাৎ তাহাদের রূপ দেখিয়া বা গলার শব্দ শুনিয়া বিস্মিত হইয়া পড়েন। এইভাবে অনেকে স্বামী-স্ত্রীর মা-বাপের ছেলেমেয়ের মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাত হইয়া থাকেন। অনেক সময় মা-বাপের বা স্ত্রীর রুগ্ন অবস্থায় তাহাদের ছেলেমেয়ের বা স্বামীর যে মৃত্যু-সংবাদ গোপন করা হইয়াছিল, মৃতকল্প সেই ব্যক্তিকে বলিতে শুনা গিয়াছে

সূক্ষ্মদেহীর দর্শন

"তুমি মরিয়া গিয়াছ, এ সংবাদ ইহারা আমার নিকটে গোপন করিয়াছিল ; আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর আমিও তোমার সঙ্গে আসিতেছি।" ইহাঁরা শীঘ্রই গিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইবার সুযোগ পাইবেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মৃতকল্প ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি যখন বিশেষ-ভাবে শিথিল হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে, তখন বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে বহির্বিষয়ে কতকটা উদাসীন হইয়া পড়িতে হয় ; তখন তাহাদের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি বাহিরের স্থূল আবরণসমূহ ক্ষীণ হইয়া পড়ায় সমধিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠে। এজন্য মৃত্যুর প্রাক্কালে বন্ধুগণ সহ মিলনের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাহাদিগকে কিছু সময়ের জন্য স্থূলদেহ ছাড়িয়া সূক্ষ্মদেহে গিয়া আত্মীয়স্বজন সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সাময়িক একাগ্রচিত্তের নিকট দর্শন ও শ্রবণযোগ্য করিয়া তুলে। বিজ্ঞান-শাস্ত্র বলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে মস্তিষ্কের ক্রিয়া অতি প্রবল হইয়া উঠে। তখন দূরস্থ আত্মীয়স্বজনদের কথা বিশেষভাবে মনে হওয়ায় তাহাদের নিকট গিয়া সূক্ষ্ম-দেহে দর্শন দেওয়া, এমন কি কথা বলাও সম্ভবপর হইয়া উঠে। স্বপ্নে মানুষ যখন অনেকটা সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত থাকে, তখন সেই ভাবের সূক্ষ্ম আত্মার সহিত এই মৃত বা মৃতকল্প ব্যক্তির সূক্ষ্ম আত্মার দেখাদেখি বাক্যালাপ ও ভাববিনিময় যেন অনেকটা সহজ হইয়া পড়ে। স্বপ্নে যে অনেকে ঔষধ প্রাপ্ত

হয় উপদেশ লাভ করে, এমন কি দীক্ষিত হইবার সুযোগও পায়, তাহার মধ্যেও আমরা উন্নত মৃত আত্মার পরহিত-সাধনের প্রবৃত্তি ও চেষ্টার বিশেষভাবে পরিচয় পাইয়া থাকি। কোথায় অর্থাদি রক্ষিত আছে, কোথায় দরকারী দলিল কাগজ-পত্র গচ্ছিত আছে, আত্মীয়স্বজনকে তাহা জানাইবার জন্য অনেক সময় পরলোকগত আত্মা বিশেষ-ভাবে সচেষ্ট হইয়া পড়েন। সুযোগ পাইলে কখনও স্বপ্নের ভিতর দিয়া কখনও বা সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী লোকের সাহায্যে আত্মীয়স্বজনের নিকট সে সব রহস্য প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়া পড়েন। একজন ধর্ম্মযাজক তাঁহার কোন ভক্ত মহিলার একখানি গোপনীয় চিঠি অতি অদ্ভুত উপায়ে একজনকে দেওয়াল খুঁদিয়া বাহির করিয়া দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সে চিঠি দেওয়ালের গায়ের কুলঙ্গির মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িল। পাছে এই চিঠি অন্যের হাতে পড়িয়া মহিলার অনিষ্ট সাধিত হয়, এই ভয়ে মৃত সাধুর আত্মা অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেক সময় অনেক মৃত ব্যক্তির আত্মা তাহার কতকগুলি গোপনীয় সংবাদ স্বপ্ন-যোগে বা অন্য উপায়ে ব্যক্তিবিশেষের নিকট প্রকাশ করিয়া যে ভাবে আত্মার সদ্গতিলাভের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। স্বপ্নে মৃত্তিকাগর্ভে

প্রোথিত ঔষধ বা বিগ্রহের বিবরণ অবগত হইয়া মাটি কাটিয়া সেখান হইতে সেই ঔষধ সেই বিগ্রহ আবিষ্কার করার কথাও আমাদের এদেশে দুর্লভ নহে। পাশ্চাত্য জগতে অধ্যাত্ম-বিদ্যাবিশারদ বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে যে সব তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যে সব বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পড়িয়া দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়! মৃত আত্মা যে কি ভাবে জীবের বিশেষতঃ আত্মীয়স্বজনের কল্যাণ-সাধনে ব্যস্ত থাকেন তাহা আমরা এই সব বিবরণ পাঠে জানিতে পারি। অপর দিকে পরলোকগত আত্মা যে কি ভাবে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সচেষ্ট থাকে জীবিতকালের শত্রুদিগকে কষ্ট দিতে চেষ্টা করে, তাহার দৃষ্টান্তও জগতে দুর্লভ নহে। মৃতা স্ত্রী স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে যে কিভাবে সময় সময় অস্থির করিয়া তোলে, সে বিষয়েও অনেক অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। সময় সময় কৃপণ ব্যক্তির সন্তানসন্ততিগণকে প্রতারণা করিয়া যাহাতে কেহ তাহার সঞ্চিত অর্থগুলি অপহরণ না করিতে পারে তাহার চেষ্টাচরিত্রের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। ব্যক্তিবিশেষে স্থানবিশেষে দ্রব্যবিশেষে অত্যাসক্তি যে কি ভাবে মৃত ব্যক্তির বন্ধনের কারণ হয় তাহাকে নানারূপ স্বর্গীয় আনন্দভোগে বঞ্চিত করিয়া থাকে, তাহারও অনেক বিবরণ অবগত হওয়া যায়। অনেক সময় মৃত ব্যক্তির আত্মা

তাহার মৃত দেহকে তাহার আত্মীয়স্বজনকে ছাড়িয়া দূরে কোথাও যাইতে ইচ্ছা করে না, জোর করিয়া লইয়া গেলেও যে সে কিভাবে ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করে, ঋষিগণ তাহা ভালরূপে দর্শন করিয়াই বোধ হয় মৃতদেহসৎকারের মুখ-অগ্নি আদি প্রথার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এইভাবে এবং অন্যান্য নানাবিধ অনুষ্ঠানের সাহায্যে পরলোকগত আত্মাকে মুক্তিদান করিতে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায় অনেক পরলোকগত আত্মা তাহার বাসস্থানে আত্মীয়স্বজন সমীপে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া তাহাদেরে সান্ত্বনা দিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে এবং এই কার্য্যে বিফল হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করে। ইহাদের যদি এতটা আসক্তি না থাকিত ইহাদের আত্মীয়স্বজন কান্না-কাটি করিয়া যদি ইহাদেরে এইভাবে আকর্ষণ না করিত, তাহা হইলে অনেক উন্নত আত্মার সংসর্গ লাভ করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিয়া ইহারা পরম সুখে বাস করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইত।



আমাদের মৃত্যুর সময় এবং তাহার পরে কি অবস্থা লাভ হয় কিভাবে থাকা হয় পুনরায় স্থূলদেহে আসিতে হয় কি না, সে সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখা কঠিন ব্যাপার।

মৃত্যুর পরে

তবে এ সম্বন্ধে সিদ্ধ-মহাত্মাগণ সমস্ত তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়া জীবের জন্য যাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা এ বিষয়ে প্রকৃত সত্যের একটা আভাস পাইতে পারি। ইহা ছাড়া জ্ঞানী সাধক যখন স্থূল দেহের অধ্যাস ও সংস্কার দূর করিয়া সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করিবার শক্তিলাভ করেন, তখন তাঁহারা পরলোকগত আত্মার গতি ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করেন; তাঁহাদের নিকট

হইতেও আমরা পরলোকের কতকটা তত্ত্ব অবগত হইবার সুযোগ পাই। তাহার পরে স্বপ্নে আমাদের যখন স্থূল ইন্দ্রিয়ের কাজ লোপ পাইয়া আমাদের মন সূক্ষ্মতত্ত্বে গিয়া লীন হয়, তখন আমরা অনেক সময় অনেক পরলোকগত আত্মার সাক্ষাৎ লাভ করি, তাহাদের নিকট হইতে অনেক অজ্ঞাত তত্ত্বের সন্ধান পাই। কোথায় সঞ্চিত অর্থ রহিয়াছে কোথায় প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র লুক্কায়িত আছে, তাহার সম্বন্ধেও পরলোকগত আত্মার সাহায্যে আমরা অবগত হইয়া থাকি। স্বপ্নে ঔষধ পাওয়া উপদেশ লাভ করা, এমন কি সাধুমহাত্মাদের নিকট দীক্ষা লাভ করা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ পরলোক সম্বন্ধে যে সব আশ্চর্য্য ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও যে কতক পরিমাণে সত্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। যখন বেদের শ্রুতি দর্শন-শাস্ত্রের যুক্তি সাধকদের অনুভূতি বৈজ্ঞানিকের গবেষণার ফল কোনও বিষয় সম্বন্ধে অনেকটা মিলিয়া যায়, তখন তাহাতে কতকটা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই সেই তত্ত্বের প্রকৃত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করাই যে বুদ্ধিমান সাধকের কাজ বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ দেখা যাউক পরলোক সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ কি কি তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

তাঁহাদের গ্রন্থে সংগৃহীত কয়েকটি সত্য বিবরণ লইয়া প্রথমে একটু আলোচনা করা যাউক :—

ডাক্তার উইলসির প্রদত্ত বিবরণ (St. Louis Medical and Surgical journal of 1899)। ইনি বলেন—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে আমি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হই··· আমার দৈহিক উত্তাপ কম (Subnormal) ছিল, নাড়ীর গতি অতি ক্ষীণ ছিল···বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম, তাঁহারা বলিলেন আমার মাথার অবস্থা ঠিক আছে···তারপর দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িল, বাকশক্তি রোধ হইবার উপক্রম হইল। ডাক্তার আমাকে মৃত মনে করিলেন, গ্রামের গির্জার ঘণ্টা মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিল···কিছু সময়ের জন্য জ্ঞান লোপ পাইল। যখন চৈতন্য লাভ করিলাম তখন মনে হইল, আমি যেন দেহের মধ্যেই আছি অথচ দেহের সঙ্গে যেন আমার সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া গিয়াছে। অনুভব করিলাম আমি যেন আত্মা, দেহ হইতে মুক্ত···আমি তখন দেহের সব অবয়ব সন্দর্শন করিতে আরম্ভ করিলাম, বুঝিয়া লইলাম যে আমি মরিয়াছি। দেহ হইতে আত্মা কি ভাবে বাহির হয় তাহা দেখিতে লাগিলাম। যেন কাহারও শক্তি দেহ হইতে আমার আত্মাটিকে দোলাইতে দোলাইতে ইহাদের সম্বন্ধটা শিথিল করিয়া দিতে লাগিল, আত্মা যেন পদদ্বয় হইতে উপরের দিকে চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রন্থিগুলি

ছিন্ন হইতে বসিল—রবারের দড়ির ন্যায় আমি যেন ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া মাথার দিকে চলিলাম—ক্রমে কোমর পেট বুক হইতে আমি সরিয়া আসিতে লাগিলাম, তাহাদের কথা ভুলিয়া যাইতে লাগিলাম।…শেষে মাথায় গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলাম…মনে হইল আমি যেন কেমন একটা জেলি মাছের মত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার পরে দেহ হইতে বাহির হইলাম, তখন আমি উলঙ্গ, লজ্জা আসিল; কিছু পরে মানুষের আকার ধারণ করিলাম। বুঝিলাম আমি যেন আলোময়, আমার যেন কাপড় পরা রহিয়াছে। দরজায় দাঁড়াইলাম, একজনের হাত আমার হাতের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল আমার বিচ্ছিন্ন অংশ আবার জুড়িয়া গেল। মৃতদেহ দেখিতে লাগিলাম, মনে হইল অনেকে কাঁদিতেছেন—যেন সকলকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না—সব ভেদভাব পার্থক্য যেন লোপ পাইতে বসিয়াছিল। আমি যে অমর তাহারাও যে অমর ইহা বুঝাইয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না; হাসি পাইল, মনে হইল ইহারা চর্ম্ম-চক্ষু দিয়া দেখে তাই আত্মা দেখিতে পায় না। বুঝিলাম আমি জীবিতই আছি। দ্বার দিয়া বাহির হইলাম রাজপথে পৌঁছিলাম—রাস্তার দৃশ্য যেন কত সুন্দর, নিজের বেশভূষা দেখিয়া আনন্দ পাইলাম। যে মৃত্যুকে ভয় করিতাম সে আর ভয়ের

কারণ রহিল না, আমি যেন পূর্ব্ববৎ জীবিত, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ হইয়াছি। আর মরিতে হইবে না—আমার আনন্দ কে দেখে! আমার পিঠ আমি দেখিতে পাইলাম। তখন দেখিলাম আমার স্কন্ধ হইতে দুই গাছি সূত্র আমাকে আমার দেহের সহিত যুক্ত রাখিয়াছে। একটু অগ্রসর হইয়া অচেতন হইয়া পড়িলাম, পরে যখন জ্ঞান হইল মনে হইল কে যেন দুইখানি হাত দিয়া আমাকে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া উপরের দিকে লইয়া যাইতেছে। যেন মেঘমণ্ডলের মধ্য দিয়া উত্তরদিকে চলিয়াছি, রাস্তাটা যেন শূন্যে দোলায়মান। একজন সঙ্গী পাইতে ইচ্ছা হইল। এত লোক মরিতেছে, কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করাতেও কেহ এ পথে আসিল না, বুঝিলাম সকলে একপথে চলে না। নিজে পাপী বলিয়া ভয় হইল—অমনি শুনিতে পাইলাম, "তোর ভয় নাই, তুই এখন নিরাপদ"। খুঁজিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, ভয় হইল। অমনি স্নেহভরা এক প্রশান্ত মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। কিছু দূরে গিয়া দেখিলাম একটা প্রকাণ্ড পাহাড় আমার পথরোধ করিয়া ফেলিয়াছে, বুঝিলাম উহাই ইহকাল ও পরকালের মধ্যবর্ত্তী সীমানা। কে যেন তখন বলিলেন, "ঐ পাহাড় অতিক্রম করিলে আর এদেহে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না,—তোমার কর্ত্তব্য এখনও শেষ হয় নাই"। পরপারে কি আছে দেখিবার ইচ্ছা হইল, দেখিলাম চারিটি

দ্বার—ভিতরে অনেক ছায়ার মানুষ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে··· কিছু পরে একখানা কালো মেঘ আসিয়া আমার গতি রোধ করিল···আস্তে আস্তে বুঝিতে পারিলাম আমি আমার দেহে পুনরায় প্রবেশ করিয়াছি। ক্রমে জ্ঞান হইল। অনুভবের কথা সকলকে বলিলাম।

ডাক্তারগণ সাক্ষ্য দিয়াছেন, ইহা মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত নহে। অন্যান্য গ্রন্থেও ঐরূপ একটা সূত্র দ্বারা আত্মার সহিত দেহের যোগের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সূত্রটি ছিন্ন হইলে নাকি দেহে আর প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ডাক্তার ফ্রাঙ্ক তাঁহার (The Psychical riddle) গ্রন্থে একজন বিশ্বাসী ধার্ম্মিক ডাক্তার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি একদিন আলো নিবাইয়া শুইতে গিয়া এক অদ্ভুত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন তাঁহার হৃৎপিণ্ডের কাজ দ্রুত চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, পায়ের দিক হইতে কি যেন একটা সুড় সুড় করিয়া উপরের দিকে উঠিতে আরম্ভ করিল,—সে দিকটা রক্তের গতি রোধ হওয়ায় শীতল হইয়া পড়িল। তারপরে তিনি হঠাৎ চোখের সামনে এক জ্যোতি দেখিতে পাইলেন, কানে ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল; অমনি তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিলেন, তিনি যেন বায়ুমণ্ডলে

স্বাধীনভাবে আনন্দের সহিত বিচরণ করিতেছেন—সেখানকার সবই যেন আনন্দে ভরপুর। যেই একটী বন্ধুর কথা মনে হইল অমনি তিনি দেখিলেন যে, তিনি তাঁহার বন্ধুর ঘরে দাঁড়াইয়া সব দেখিতেছেন সব শুনিতেছেন। পরে মনে হইল তিনি যেন একটা নূতন দেহে নূতন জীবনে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি যে দেশে সেখানে দেশকালজনিত ব্যবধান বা দূরত্ব জ্ঞান নাই—সবই আনন্দে ভরপুর। হঠাৎ পৃথিবীর আত্মীয়দের কথা মনে পড়িল, তাহাদের নিকট যাইতে ইচ্ছা হইল। ঘরে গিয়া দেখেন দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাকে ইচ্ছামত চালাইতে চেষ্টা করিলেন, ক্রমে চেতনা আসিল, উঠিয়া বসিলেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন সেইদিন রাত্রে বন্ধুটী তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

মৃত্যুমুখ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির মুখে যে সব অদ্ভুত কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ছায়া বেশ সুন্দরভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। লোকনাথ নামে আমার কোন পরিচিত লোক মৃত্যুশয্যায় শায়িত। ডাক্তার বলিল দেহে প্রাণ নাই, তখন তাহাকে ঘর হইতে বাহির করা হইল। যখন শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল তখন সে হঠাৎ চোখ খুলিল। আস্তে আস্তে তাহার জ্ঞান হইলে সে বলিতে লাগিল, "আমি

বাস্তবিকই মরিয়াছিলাম, প্রথমে দর্শন পরে শ্রবণ ও বাকশক্তি লোপ পাইল। তারপরে দেখিলাম আমি যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ হইয়া দেহমধ্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ক্রমে যেন মাথার দিকে চলিয়া গেলাম, সেখান হইতে কে যেন আমাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। আমি মাঝে মাঝে পিছন ফিরিয়া নিজের শবদেহ দেখিতে ও সকলের কান্না শুনিতে লাগিলাম, আমার যেন একটুও যাইতে ইচ্ছা ছিল না। ক্রমে দেহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল, মায়ামমতা কমিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। এমন সময় কে যেন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল 'এ কাহাকে এনেছিস্! শীঘ্র একে ফিরিয়ে দিয়ে অমুক গ্রামের লোকনাথকে নিয়ে আয়।' সে লোকনাথ তখন সুস্থ ছিল। শুনিতে পাওয়া যায় হঠাৎ সামান্য অসুখে সেদিন সে মারা গিয়াছিল।

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ষ্টেড সাহেব (W. T. Stead) অতি অদ্ভুত কৌশলে পরলোকগত জুলিয়ার (Julia) কতকগুলি চিঠি প্রকাশ করিয়া আত্মার দেহত্যাগ ও পরের অবস্থা সম্বন্ধে বেশ সুন্দর একটী চিত্র আমাদের নিকট অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। সেই গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, জুলিয়া বলিতেছেন—"মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি কখনও তোমাকে এতটা নিকটে পাই নাই। আমি এখন দেহ হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমি মৃত্যুসময় কোনও যাতনা অনুভব করি

নাই, একটা শান্তি ও আনন্দই আস্বাদ করিয়াছিলাম। বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া মনে হইল আমি এতটা সুস্থ হইয়াছি! সকলের কান্না দেখিয়া আমার হাসি পাইল, ভাবিলাম ইহারা কি নির্ব্বোধ! একটু পরে আমি এক স্বর্গীয় জ্যোতি দেখিতে পাইলাম—দেখিলাম একজন স্বর্গীয় দূত (angel)। তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—আমি তোমার নূতন জীবনের বিধি-ব্যবস্থাগুলি (Laws of new life) শিক্ষা দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। তারপরে তাঁহার সঙ্গে চলিলাম, রাস্তাগুলি দৃশ্যগুলি যে এত সুন্দর তাহা আগে জানিতাম না। আমার দূতের পাখা ছিল, তিনি কি সুন্দর কি মনোহর শুভ্র বসনে ভূষিত ছিলেন। রাস্তায় অনেক সূক্ষ্মদেহধারীর সহিত দেখা হইতে লাগিল। হঠাৎ আত্মীয়স্বজনদিগের নিকট ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল, অমনি আমার চালক আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন। আমার মৃতদেহ দেখিলাম, তাহাতে আসক্তি দেখিতে পাইলাম না। আত্মীয়স্বজনের কান্নাকাটিতে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে আমার আনন্দের অবস্থা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কেহ আমার কথা আমার ভাব বুঝিতে পারিল না। আমার খুব দুঃখ হইল। আমার চালক আমাকে বুঝাইলেন—বলিলেন এমন দিন আসিবে যখন তুমি ইহাদেরে সব বুঝাইতে সক্ষম হইবে।

আমাকে অন্য দিকে ডাকিয়া লওয়া হইল। আমি যেন একা, ভগবৎসান্নিধ্যটা বেশ অনুভব করিতে পারিলাম কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। 'যিনি তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন তিনি তোমার সহিত কথা বলিবেন' এই কথা হঠাৎ শুনিতে পাইলাম, কিন্তু কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া একটু ভয়ও হইল। তখন আমার চালক বলিলেন যে, তিনিই কথা বলিতেছিলেন। ইহার পরে সমস্ত অমর আত্মার জ্যোতি দেখিতে পাইলাম। তাঁহারা আমায় আমার ত্রাণকর্ত্তাকে দেখাইয়া দিলেন। তিনি যে আমার থাকার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন তাহাও বলিলেন। সেখানকার আনন্দের কথা আর কি বলিব! তাঁহার হাসির জ্যোতিতে যেন সব আলোকিত হইয়া গেল; তখন অনেক পরিচিত ও অপরিচিত প্রেমপরিপূর্ণ মুক্তাত্মার দর্শন পাইলাম—সকলেই যেন ভালবাসার জীয়ন্ত বিগ্রহ, সকলের মাঝখানে বসিয়া আছেন আমার প্রাণের দেবতা আমার ত্রাণকর্ত্তা। তিনি যে আমার কে তিনি যে আমার কত আপনা তাহা যেন বুঝিতে আরম্ভ করিলাম। সেখানকার সবই যে জ্ঞানে জ্যোতিতে প্রেমে আনন্দে ভরপূর, তাঁহার স্বরূপ প্রেমময় নাম প্রেমময়—সবই যেন প্রেম প্রেম প্রেম। সে আনন্দ মন কল্পনা করিতে পারে না, ভাষা বর্ণনা করিতে অক্ষম। সেখানে না আছে জড়তা না আছে বার্দ্ধক্য না

আছে ভাবনা-চিন্তা……। আত্মা দেহত্যাগের পরে ঠিক আগের মতই থাকে, তাহার অভ্যাস অনুভূতি জ্ঞান আদি পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকিয়া যায়। স্থূলদেহের সংস্কারগুলি যত ক্ষয় হইতে থাকে ততই সূক্ষ্মদেহের সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। মানুষ সূক্ষ্মদেহের কাজের জন্য যতটা দায়ী স্থূলদেহের কাজের জন্য যেন ততটা দায়ী নহে; সেখানে মনটা প্রাণটা হৃদয়টা দেখিয়াই মানুষের, শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হইয়া থাকে। সেখানে চিন্তার আশ্চর্য্য প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। সৎ এবং অসৎ চিন্তা কিভাবে চারিদিকে শক্তি বিকীর্ণ করিয়া মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণের কারণ হইয়া পড়ে তাহা যেন বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেখানকার ভাল-মন্দনির্দ্ধারণের মানদণ্ড কিছু অন্য রকমের। এখানে যাহারা ভাললোক বলিয়া পরিচিত সেখানে তাহাদের কাহারও কাহারও দুরবস্থা দেখিয়া সময় সময় কষ্ট হয়, আবার এখানে যাহারা নিন্দিত তাহাদের অনেকেই সেখানে আদরে গৃহীত হইয়া থাকে। এখানকার অত্যাবশ্যকীয় জিনিসগুলি সেখানে যে কিরূপ অকাজের বলিয়া পরিত্যক্ত তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমরা এখানকার সংবাদ এখানকার আনন্দবার্ত্তা তোমাদের ওখানে পাঠাইবার জন্য বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকি। এখানেও অনেক-গুলি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা আমাদের পরম

প্রেমাস্পদের সঙ্গে যে কি আনন্দে বাস করি তাহার দৃষ্টান্ত তোমাদের মর্ত্ত্য জগতে মিলিবে না। আমরা এখানে প্রেমময়কে লইয়া বাস করি তাই আমাদের সবই আনন্দে ভরপুর ; আর তোমরা প্রেমময়কে ভুলিয়া প্রেমময়কে বাদ দিয়া বাস কর, তাই তোমাদের সবই যেন দুঃখে পরিপূর্ণ। জগতের বাৎসল্য ও মধুর প্রেম শুধু আমাদের প্রেমময়ের প্রেমের কণা বা রশ্মিমাত্র। ঐ সমস্ত প্রেমের পূর্ণ পরিণতি ও সামঞ্জস্য যেখানে সেখানেই আমাদের প্রেমময় বাস করেন। সকলকে ভালবাসিতে আরম্ভ কর—ভালবাসাই সাধনা, ভালবাসাই ঈশ্বর। স্বার্থপর ভালবাসা ভালবাসা নামের যোগ্য নহে। ভালবাসা মানেই যে স্বার্থত্যাগ। যাহাকে ভালবাস তাহার স্থানে নিজেকে রাখিয়া নিজের জন্য যাহা কিছু দরকার তাহার জন্য তাহা করিতে আরম্ভ কর। ভ্রাতৃপ্রেম ভগবৎপ্রেমের অনেকটা কাছাকাছি বাস করে। যে ভালবাসিতে জানে সে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করে, সে ভগবানের মত হইয়া উঠে। Love is God and God is love প্রেমই ভগবান, ভগবানই প্রেম। The more you love the more you are like God তুমি যত ভালবাসিবে ততই ভগবানের মত হইবে। Love is the fulfilling of the law প্রেমই ভগবৎবিধানকে সফল করিয়া তোলা, প্রেমই ভগবৎমুখচন্দ্র সন্দর্শন করা। যদি

তুমি ভগবানের সঙ্গ চাও—ভালবাস, যদি তুমি স্বর্গে বাস করিতে চাও—ভালবাসিতে শিক্ষা কর।...... আমি তাহার মৃত্যুশয্যার কাছে দাঁড়াইয়াছিলাম তাহার মৃত্যুতে তোমাদের কষ্ট দেখিয়া কতরূপে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, সে এখানে আসিয়া তাহার মাতা স্বামী প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া কি যে আনন্দ উপভোগ করিতেছে তাহা দেখাইতে পারিলে তোমাদিগকে সুখী করিতে পারিতাম। তোমরা না ভগবানে বিশ্বাস কর? বিশ্বাসী ভক্ত কি করিয়া মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তোমরা কি মনে কর তোমাদের প্রিয়জনকে রক্ষা করিবার কেহই নাই, তোমরা কি মনে কর তোমরা ভগবান অপেক্ষা তাহাকে বেশী ভাল-বাসিতে?...আমি তোমাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, তাই তোমাদের ভুল ভাঙ্গিতে এত চেষ্টা করি। মনে রাখিও বিশ্বাসী সর্ব্বদা আনন্দে বাস করে, ভগবান তাহার সুখশান্তির জন্য মহা ব্যগ্র। এ সময় বুঝিয়া লও তোমাদের জগৎ কত অসত্য, পরলোক কত সত্য। অবিশ্বাসীর নিকট যাহা সর্ব্বনাশ, বিশ্বাসীর নিকট তাহা মোটেই নাশ নহে। দুঃখ-কষ্ট বাস করে শুধু অবিশ্বাসীর হৃদয়ে।......এতদিনে আমার এদেশ সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞানলাভ হইয়াছে। দেহত্যাগের কালটা সময় সময় দুঃখকষ্টে ভরা মনে হয়। এই কষ্ট

কাহারও নিকট বেশী ও কাহারও নিকট কম সময়ব্যাপী মনে হয়। অনেকের পক্ষে ইহা অতি অল্পক্ষণস্থায়ী ব্যাপারবিশেষ মাত্র। মৃত্যু ও জন্ম অনেকটা একভাবাপন্ন—একটা স্থূলে জন্ম আর একটা সূক্ষ্মে জন্ম। মৃত্যুসময় আত্মা মুক্তিলাভের চেষ্টা করে। শান্ত সংযত আত্মা অনেক সময় মৃত্যুবেদনা মোটেই অনুভব করে না। যেখানে আসক্তি যত বেশী সেখানে বন্ধনত্যাগ ততই কষ্টপ্রদ। শরীরত্যাগের পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে জীবিত মনে করিতাম। নগ্ন-ভাবটা ভাল লাগিত না—কাপড় পরিবার ইচ্ছা সে অভাব পূর্ণ করিল; কারণ এখানে যাহা মনে ভাবি তাহাই হইয়া বসি। সকল আত্মার জন্যই স্বর্গীয় দূত প্রেরিত হইয়া থাকে। সর্ব্বজীবে তাঁহার দয়া অতুলনীয়। যে তাঁহার সাহায্য যতটা চায় সে তাহা ততটা পায়। আমাদের পাপের কুয়াসা তাঁহাকে দেখিতে দেয় না; পাপের শাস্তির ভিতর দিয়া তিনি আমাদিগকে আনন্দধামের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলেন……।

"এদেশে আসার পরে আমার চালক আস্তে আস্তে আমাকে আমার আত্মীয় পূর্ব্বপরিচিত আত্মাগুলির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া চিনিতে আমার একটু সময় লাগিল। প্রথমতঃ তাঁহারা আগে আসিয়া এদেশের বিধানমতে চলিয়া কতকটা

অগ্রসর হইয়াছেন আর আমি অনভিজ্ঞ; তারপরে আমি অপরিণত অবস্থায় দেহত্যাগ করায় আমাকে আমার অনেক-গুলি আশা-ভরসার অতৃপ্ত সংস্কার দূর করিতেও কতকটা সময় লাগিয়াছিল। আমার ছোট ভগ্নীর সঙ্গে যখন আমার দেখা হইল তখন আমার খুব আনন্দ হইয়াছিল। যাহাতে আমি তাহাকে চিনিতে পারি সেজন্য সে তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বের শিশুমূর্ত্তিটি ধরিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল, ভালরূপে পরিচিত হইবার পরে সে আবার একজন পূর্ণবয়স্ক নারীরূপ গ্রহণ করিল। যখন পরলোকে কেহ নূতন আইসে, তখন তাহার মৃত আত্মীয়গণ প্রথমে তাঁহাদের পূর্ব্বপরিচিত রূপ ধারণ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হন। স্বর্গেও অধিকারী-ভেদে উচ্চনীচ ভেদ এবং ভেদব্যঞ্জক স্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে। আত্মা যত উন্নতিলাভ করিতে থাকে তত উন্নত স্থানে যাইবার বাস্ করিবার অধিকার লাভ করে।

আমেরিকার একজন যুবক পাদ্রিকে যখন সকলে মৃত মনে করিয়া কবর দিতে যায়, তখন সে প্রাণপণে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল যে সে মরে নাই। তাহাকে যখন কবর দেওয়া হইল তখন তাহার আর দুঃখের সীমা রহিল না। পরে ভগবৎকৃপায় আশ্চর্য্য রকমে তিনি সে কবর হইতে বাহির হইবার সুযোগ লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এখন মোটের উপর দেখা যাউক এই সব বিবরণ হইতে আমরা দেহত্যাগের সময়কার এবং তাহার অব্যবহিত পরের অবস্থা সম্বন্ধে কি তথ্য অবগত হইতে সক্ষম হই।

(১) আমরা বুঝিতে পারি যাঁহারা স্বাভাবিকভাবে পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন তাঁহাদের মৃত্যুযন্ত্রণা খুব কমই অনুভব করিতে হয়, যাঁহারা জ্ঞানী সাধক তাঁহারাও যে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে বরণ করেন মৃত্যুটা যে তাঁহাদের নিকট শুধু মার কোলে ঘুমাইয়া পড়ার মত একটা স্বাভাবিক ব্যাপার তাহাতেও আমাদের সন্দেহ নাই। কেহ কেহ যে মৃত্যুযাতনার ভিতর দিয়া সমস্ত দেনা শোধ করিয়া কর্ম্মফল শেষ করিয়া ভগবৎধামে যাইবার অধিকার লাভ করে তাহাও আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যে মৃত্যু-যাতনাকে একেবারে অস্বীকার করিতে যাইব তাহাও সমীচীন নহে। যাতনার ভিতর দিয়া আমরা যে বিশেষ-ভাবে শিক্ষালাভ করি আমাদের দেহাসক্তি কমাইবার সুযোগ পাই তাহা মনে রাখিতে হইবে। মৃত্যুযাতনা কাহারও যে খুব কম কাহারও বেশী ভোগ করিতে হয় এবং সময় সময় মৃত্যুযাতনার ভিতরে ভগবৎকৃপায় আমাদের যে বোধশক্তি চলিয়া গিয়া আমাদের যাতনা লাঘব করিয়া দেয় তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জন্মযাতনা মৃত্যুযাতনা প্রায় এক রকমের—ইহার একটা স্থূলে জন্মলাভ

অপরটা সূক্ষ্মে জন্মলাভ। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহা ততটা যাতনার কারণ নহে—উভয় অবস্থাতেই প্রকৃতি হইতে বোধ-শক্তি অনেকটা কম হইয়া যায়। ইহার মধ্যেও ভগবানের ব্যবস্থা দেখিয়া ভক্ত ভাবে বিভোর হইয়া পড়েন।

(২) দেহত্যাগের সময় ও অব্যবহিত পরে কিছু সময়ের জন্য আমাদের জ্ঞান লোপ পায়। দেহের সহিত সমস্ত বন্ধন ছেদন করার সময় এবং অন্য দেহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকার অবস্থায় জ্ঞানটা না থাকাই বোধ হয় কল্যাণের কারণ।

(৩) একটু পরেই আমাদের জ্ঞানলাভ হয়, তখন আমরা যে দেহ হইতে পৃথক আমরা যে অজর অমর আত্মা দেহ যে আমাদের একটা বাসস্থান মাত্র একটা আবরণ-বিশেষ তাহা আমরা বিশেষতঃ সাধু-সজ্জনের আত্মা বেশ সুন্দরভাবেই বুঝিতে পারে।

(৪) অনেকেই বেশ সুন্দরভাবে বুঝিতে পারেন তাঁহারা যেন পদদ্বয় হইতে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠিতেছেন, যে অঙ্গ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতেছেন সে অঙ্গ যেন শীতল ও অবশ হইয়া যাইতেছে—সেখানকার সব গ্রন্থিগুলি যেন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। তখন সূক্ষ্মদেহটি যেন অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আকার ধারণ করিয়া মাথার মধ্যে গিয়া পৌঁছিবার পরে সেখান হইতে যেন বাহিরে

গিয়া স্থূলদেহের সঙ্গে সূক্ষ্মদেহের একটা সূত্রযোগে সম্বন্ধটা উপলব্ধি করিবার সুযোগ লাভ করে, এই সূত্র ছিন্ন হইয়া গেলে আর যেন স্থূলদেহে প্রবেশের অধিকার থাকে না। এ অবস্থায় কেহ কেহ সংস্কারবশে মনে করে, কে যেন জোর করিয়া দেহ হইতে আত্মাকে বাহির করিয়া লইয়া যায়।

(৫) দেহ হইতে বাহির হইবার পরেও অনেকে যে স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হন না। স্থূলদেহধারী আত্মীয়স্বজনগণের নিকট নগ্নাবস্থায় উপস্থিত হইতে লজ্জাবোধ করার ফলে ইচ্ছামাত্র একটা সূক্ষ্ম পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া পড়েন। সূক্ষ্মজগতে ইচ্ছা ও কার্য্যসাধনের মধ্যে স্থূলজগতের ন্যায় কোন ব্যবধান পরিলক্ষিত হয় না।

(৬) আত্মীয়স্বজনের দুঃখকষ্টে কান্নাকাটিতে অনেক সময় পরলোকগত আত্মাকে বিচলিত হইয়া পড়িতে হয়, তাহাদেরে ছাড়িয়া দূরে যাইতে প্রবৃত্তি হয় না, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতে নিজের মুক্তাবস্থার কথা আনন্দের কথা জানাইয়া তাহাদিগকে সুখী করিতে নানারূপ চেষ্টা আরম্ভ করে। এসব চেষ্টায় বিফল হইয়া সে কেমন একটা যাতনা ভোগ করিতে থাকে। নিম্ন অধিকারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিতেও পারেন না যে তাঁহারা মরিয়া গিয়া-

ছেন, এবোধ জন্মিলেও তাঁহারা পুনরায় দেহে ফিরিয়া যাইতে নানারূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন। দেহ যাহাতে নষ্ট না হয় দেহ যাহাতে জ্বালাইয়া না ফেলে, সেজন্য বিশেষভাবে তিনি চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁদিগকে মুক্তি দিবার জন্যই দেহসংকারের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল আত্মারা দেহত্যাগের পরেই শান্তিবোধ করিতে থাকেন, চারিদিকে একটা উজ্জ্বল আলো অপার্থিব্ জ্যোতি আনন্দের ঢেউ উপলব্ধি করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া পড়েন। মৃত্যুর পরেই যেন মুক্ত আত্মা স্বর্গীয় দূত তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতে সাহায্য করিতে শিক্ষা দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সাধুগণ ইহাঁদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সুখলাভ করেন, আর অসাধুগণ নিজেদের দুষ্কৃতির ফলে ইহাঁদের সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া ইহাঁদের কাজে বাধা দিতে আরম্ভ করেন।

(৭) ইহার পরে সাধুদের স্বর্গভোগ অসাধুদের সাময়িক নরকভোগের কাল আসিয়া পড়ে। আনন্দভোগের নামই স্বর্গভোগ। যাঁহারা জীবিত অবস্থায় জীবসেবায় স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পরকে আনন্দদান করিতে পরের কল্যাণসাধন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই এই স্বর্গসুখভোগের অধিকার লাভ করেন। কাহারও মতে স্বর্গ তিনটি—যথা, ভূ র্ভুবঃ স্বর্লোক। কাহারও মতে স্বর্গ সাতটি, ভূ র্ভুবঃ

স্বঃ জন মহ তপ ও সত্য। যন্ত্রণাভোগই জীবের নরক-ভোগ। যাহারা ইন্দ্রিয়সুখে অত্যধিক আসক্ত তাহাদের ভোগাসক্তি থাকিবে অথচ ভোগের উপকরণ থাকিবে না, ইহাই নরকভোগ। "মনঃপ্রীতিকরঃ স্বর্গো নরকস্তদ্‌বিপর্য্যয়ঃ।" যাহা মনের প্রীতিকর তাহাই স্বর্গ যাহা মনের অপ্রীতিকর তাহাই যে নরক। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সকলকেই একবৎসর কাল প্রেতলোকে বাস করিতে হয়, অনেকে আবার আপন কর্ম্ম অনুসারে অধিক কাল প্রেতলোকে বাস করিয়া থাকে। এখানে প্রেত-শব্দের অর্থ আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থান করা। শ্রাদ্ধ এই প্রেত অবস্থায় স্থিত সূক্ষ্মদেহের কল্যাণসাধনের চেষ্টাবিশেষ। আমাদের বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ পুরুষদের শুভ ইচ্ছা শুভ কামনা যে সূক্ষ্ম আত্মার কল্যাণের আনন্দলাভের সহায় হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

মৃত্যুর সময় সূক্ষ্ম আত্মাকে লইয়া যাইবার জন্য ভগবানের নিকট হইতে যে দূত আসিয়া থাকে তাহার বিবরণ প্রায় সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। খারাপ লোকের আত্মাকে লইয়া যাইবার জন্য ভীষণাকার যমদূতের আগমনের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে মানুষের সমস্ত জন্মব্যাপী অনুষ্ঠানের অনুতাপতে তাহার একটা ভাবনাময় দেহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। জন্মমৃত্যুর অন্তরালটি

মধ্যবর্ত্তী সময়টি অভিনিবেশ ধ্যান ও অভ্যাসের ফলাফল বিচার দ্বারা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। মৃত্যু-কালের মানসিক ভাব দ্বারা পরলোকের অবস্থা পুনর্জ্জন্ম অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়, একথা আমরা গীতাতেও দেখিতে পাই। মৃত্যুকালে মনের অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা সমস্ত জীবনব্যাপী কার্য্যকলাপ ভাবনাঅনুভূতি দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। যে যে-ভাবের সূক্ষ্মদেহ অর্জ্জন করি-য়াছে মৃত্যুকালে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটী নাকি তাহারই অনুকূলভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে; যেখানে ইহার ব্যত্যয় দৃষ্ট হয় সেখানে মৃতকল্প ব্যক্তি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অবস্থিতির জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলাফল দ্বারা ততটা চালিত হন না। যে ব্যক্তি চিরজীবন সৎভাবে চালাইয়াছে মৃত্যুকালে তাহার মনে সৎভাবের একটা স্রোত আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা তখন তাহার ভিতরকার ভাবের অনেকটা অনুকূল হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি জীবনটা খারাপভাবে চালায় তাহার মনের ভাব ইহার বিপরীত হওয়াই যে স্বাভাবিক। জীবিত অবস্থায় যে সকল ধ্যান অভিনিবেশ ও অভ্যাস অর্জ্জিত হইয়া থাকে, দেহত্যাগের সময় তাহা একটা সংস্কার ভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবকে সেই ভাবের অনুরূপ নিয়মাবলীর অধীন করিয়া রাখে—তাহার মানসিক ভাবগুলিকে তদনুকূল ভাবে

পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। কিছু পরে সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার মনোগত ভাব ও অবস্থা অনুসারে তাহার একটা প্রকৃতি প্রস্তুত করিয়া দেয়, মৃত্যুযন্ত্রণা আদি অন্য সব ভাবনা লোপ করিয়া দেয় কিন্তু জীবনব্যাপী কর্ম্ম ধ্যান বা অভিনিবেশের অনুরূপ এক নূতন সূক্ষ্ম ভাবনা উৎপন্ন করিয়া তোলে, ইহাই স্বপ্নশরীরবৎ ভাবনাময় দেহ। ভাবদেহীরা অস্পষ্টভাবে পরজন্মের স্ফুরণ দর্শন করে। মৃত্যুকালে যে ভগবানের নাম শুনান হয় তাহা এই ভাবময় দেহকে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন করিয়া তুলিবার জন্য। এই ভাবনাময় দেহ অনুসারেই পরলোকের অবস্থা ও পুনর্জ্জন্ম নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যাহার ভাবনাময় দেহ যেরূপ তাহার কাছে তদনুরূপ সূক্ষ্ম-দেহধারী আত্মা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। মানুষ যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকে তখন তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার মানসিক অবস্থা অনুসারে ভালমন্দ সূক্ষ্ম-দেহধারী জীব এবং তাহার পরলোকগত আত্মীয়গণ আসিয়া অনেক সময় উপস্থিত হন। শুনিতে পাওয়া যায়, সেখানে কোনও উন্নত সাধক উপস্থিত থাকিলে বা ভগবৎ-কীর্ত্তন বা স্মরণ দ্বারা একটা সাত্ত্বিক ভাব আনিয়া ফেলিতে পারিলে, তখন সেখানে কোনও খারাপ আত্মার আসিবার উপায় থাকে না। দেহত্যাগের পরে আত্মার পরলোকের অনুভূতি লাভ করিতে কিছু সময় লাগে—স্বর্গীয় দূতগণ এই

ভাবের শিক্ষা দিয়া নবাগত আত্মাকে পরলোকবাসের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পরলোকে যাহাতে বেশ আনন্দে বাস করিতে পারে সে বিষয়ে সাহায্য করিতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়া পড়েন। দূতের সঙ্গে বায়ুমণ্ডল দিয়া উর্দ্ধলোকে অগ্রসর হইবার সময় সব জিনিসই যেন কেমন একটা অপার্থিব জ্যোতিতে সৌন্দর্য্যে ভরপূর বলিয়া মনে হইয়া থাকে। যাহার আত্মা যত উন্নত সে ততটা এই জ্যোতি এই সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আনন্দ আস্বাদ করিবার অধিকার লাভ করে। কিছু পরে সমস্ত পরলোকগত আত্মার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইতে আরম্ভ করে। তাঁহারা এই নবাগত আত্মার পরিচিতরূপেই আসিয়া প্রথমে দেখা দেন। দেহের আকার ও সূক্ষ্ম পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন অনেক অংশে তাহাদের ইচ্ছাশক্তির ভাবনাশক্তির দ্বারা সহজে সাধিত হইয়া থাকে। উন্নত পরলোকগত জীব সময় সময় শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের নিকট আপন আপন অভীষ্ট দেবতাদের নিকট নীত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। যে যাঁহার ভক্ত তাঁহার কাছে যাইবার একটা তীব্র ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকাই যে স্বাভাবিক; সেই ইচ্ছার তীব্রতা পবিত্রতা দ্বারা সেই সেই লোকে গতি ও স্থিতি নিয়মিত হইয়া থাকে। সে দেশের দৃশ্য সে দেশের আনন্দ সে দেশের পবিত্র ভালবাসা এ দেশবাসীর পক্ষে কল্পনা করাও যে অসম্ভব ব্যাপার।

কোন কোন শাস্ত্রে মৃত্যুর পরেই দেহান্তর-গ্রহণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবত এবং উপনিষদবিশেষে দেখিতে পাই জলৌকা যেমন একটি পদার্থ গ্রহণ করিয়া তারপরে পূর্ব্বগৃহীত পদার্থটিকে ত্যাগ করে, আত্মা (সূক্ষ্মদেহ)ও তেমনি অপর একটি স্থূলদেহ স্থূলদেহের বীজ গ্রহণ করিয়া তাহার পরে বর্ত্তমান দেহটি ত্যাগ করিয়া থাকে। অন্যত্র আবার দেখিতে পাই দেহী স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া কিছুদিন প্রেতলোকে বাস করে, তাহার পরে আপন আপন কর্ম্ম অনুসারে স্বর্গ বা নরকে গিয়া কিছুদিন পুণ্য-পাপের সুখদুঃখ ভোগ করিয়া উত্তম-অধম বংশে সাত্বিক-তামসিক দেহ অবলম্বন করিয়া জন্মগ্রহণ করে। শাস্ত্রের 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত-লোকে পুনরাগমন করে ইত্যাদি বচনের ভিতরে আমরা স্থূলদেহ ছাড়িয়া সূক্ষ্মদেহে কিছুদিন অবস্থানের সংবাদই পাইয়া থাকি। এই উভয় ভাবের শাস্ত্র হইতে পরস্পর-বিরোধী দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। একদল পরলোকে সূক্ষ্মভাবে অবস্থানটা অস্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে মরণের পরেই জন্মগ্রহণ করিতে হয়; অপর দল পুনর্জ্জন্ম অস্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে মৃত্যুর পরে স্বর্গবাসের মধ্য দিয়াই ক্রমোন্নতির বিধানমতে আস্তে আস্তে দেহী চরম মুক্তির অধিকার লাভ করে। আমাদের

বিশ্বাস এই উভয় মতের মধ্যেই কতকটা সত্য নিহিত থাকিলেও কোনটীই সত্যকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। অধিকারী অনুসারে গতি নিয়মিত হয়, সুতরাং সকলের পক্ষে এক রকমের বিধিব্যবস্থা সঙ্গত মনে হয় না। গতিসম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায়, "তীব্র-সংবেগানাং আসন্ন-মৃদু-মধ্যাদিমাত্রাৎ ততোহপি বিশেষঃ" তীব্র বাসনা লইয়া যাহারা দেহত্যাগ করেন, তাঁহারা অনতিবিলম্বে নূতন দেহ ধারণ করেন, বাসনার তীব্রতার তারতম্যানুসারে তাঁহাদের পুনর্দেহধারণের কাল নিয়মিত হয়। নিদ্রার সময় আমরা যেমন কোনও তীব্র সংস্কার লইয়া শয়ন করিলে পরদিন উঠিয়াই সে কাজ পূর্ণ করিতে যাই, মনে কোনও তীব্র ইচ্ছা না থাকিলে আস্তে আস্তে বিছানা ত্যাগ করিয়া থাকি ইহাও কতকটা সেইরূপ। আসল কথা এই যে কোনও দেহী অবিলম্বে অন্য স্থূলদেহ ধারণ করে, কেহ বা কালবিলম্বে দেহধারণ করে। উভয় মতই সত্য, তবে কোন মত কাহার পক্ষে প্রযোজ্য তাহা বিচারপূর্ব্বক সূক্ষ্মদর্শন প্রভাবে অনুমিত হওয়াই বিধিসঙ্গত। পুনর্জন্মতত্ত্বে এ বিষয়ে ভাল করিয়া বিচার করিতে চেষ্টা করা যাইবে।



মৃত্যুর কিছু পরে উন্নত আত্মার সঙ্গে তাঁহাদের আদেশ মত চালিত হইয়া কতকটা সে আলোর দেশের অপার্থিব স্বর্গীয় মনোরম জ্যোতির্ম্ময় হাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার পরে মৃত আত্মা সূক্ষ্মদেহধারী জীব আপন মনোমত আপন সাধনায় অনুকূল লোকবিশেষের আদর্শবিশেষের কতকটা নিকটে গিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণ রামচন্দ্র বুদ্ধ যীশু মহম্মদ আদি শ্রেষ্ঠ ভগবৎঅবতার-গণের পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে। যে যাহার ভক্ত যে যাহার আদর্শে জীবন গঠিত করিয়া যে লোকের যে ধামের উপযুক্ত হইয়াছে, তাহার আত্মাকে মৃত্যুর পরে কিছু সময়ের মধ্যে সেখানকার উপযুক্ত করিয়া তুলিয়া সেখানে লইয়া যাওয়া হয়। আমরা সেখানে যাইতে যতটা ব্যস্ত

আনন্দ ধাম

আমাদের আরাধ্য ইষ্টদেব আমাদিগকে সেখানে লইয়া গিয়া আমাদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট অশান্তি দূর করিয়া আমাদিগকে তাঁহার আনন্দসাগরে ডুবাইয়া রাখিতে কোটি-গুণ অধিক ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার মঙ্গলময় বিধান তিনি অবহেলা করেন না—তাহার ভিতর দিয়া আমাদিগকে তাঁহার আনন্দধামের উপযুক্ত করিয়া তোলেন। মৃত্যুর সময় আমাদিগকে তাঁহার আনন্দধামে লইয়া যাইবার জন্য সেখানকার বিধানগুলির সহিত আমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা আমাদিগকে সেখানকার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য তিনি অনেক উন্নত আত্মা অনুকূল সঙ্গী আদর্শ গুরু প্রেরণ করিয়া থাকেন। সমস্ত পথে তাঁহাদের মধুর শিক্ষা দ্বারা আমরা আস্তে আস্তে সে দেশের উপযুক্ত হইতে থাকি। আত্মীয়স্বজনের দুঃখ-কষ্ট অনেক সময় আমাদের এই আনন্দভোগে বাধা দিয়া থাকে। অনেক সময় আমাদিগকে সেই মধুর আনন্দউপভোগ ত্যাগ করিয়া আত্মীয়স্বজনকে শান্ত করিবার জন্য সান্ত্বনা দিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে হয়, তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়। জীবিত অবস্থায় যাহার আসক্তি যত প্রবল ছিল সে এইজাতীয় কষ্ট তত বেশী ভোগ করে এবং স্বর্গীয় শান্তিরস আস্বাদনে তত বাধা পায় বঞ্চিত হয়। হায়, আমরা নিজের স্বার্থে অন্ধ হইয়া এইভাবে তাহাদের

কষ্টের কারণ হই, উন্নতিলাভে আনন্দআস্বাদনে বাধা দেই। মৃত্যুসময় আত্মীয়স্বজনের শান্তভাব পবিত্র ভালবাসা শুভ ইচ্ছা ভগবৎসকাশে কল্যাণপ্রার্থনাগুলি তাহাদের কল্যাণ-সাধনের আনন্দপ্রাপ্তির সহায় হয়। এজন্য সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করিতে নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়, সকল শাস্ত্রেই কোনরূপ শ্রাদ্ধাদির লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। হায়, আমরা না বুঝিয়া আমাদের মৃত আত্মীয়দের কতরূপ কষ্টের কারণ হইয়া থাকি! লোকান্তরিত আত্মা ভগবৎ-প্রেরিত আদর্শ আত্মার প্রকৃত সৎগুরুর সঙ্গে চলিতে চলিতে যতই সেই আলোর দেশের ভগবৎপ্রেমধামের আনন্দ-ধামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ততই তাহার হৃদয় সেই ইষ্টধামের ইষ্টদেবের অপার্থিব মনোহর জ্যোতিতে সেই স্বর্গীয় প্রেমরসে বিভোর হইয়া যায়। সেখানকার মুক্তাত্মাগণের স্বর্গীয় প্রেমজ্যোতি মধুর মুরতি আদর-সোহাগ ভাষায় বর্ণনা করিতে পারা যায় না। তারপরে যখন সে গিয়া তাহার ইষ্টদেবের অনেকটা কাছে উপস্থিত হয়, তখন সেখানকার শান্তির সেখানকার পবিত্রতার সেখান-কার প্রেমানন্দের কথা আর কি বলিব। সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের সার রস নিঙড়াইয়া যেন সেই জীবন্ত ইষ্টমূর্ত্তিটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। তাঁহার সৌন্দর্য্য তাঁহার লাবণ্য তাঁহার

মাধুর্য্য তাঁহার আদর-সোহাগ অন্যান্য সমস্ত সংস্কার ভুলাইয়া তাঁহার বিমল চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রেমরসে পরিভাবিত আত্মবিস্মৃত করিয়া জীবন সার্থক করিতে আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া তোলে। তাঁহার নীরব সুরের মধুরবাণী নবাগত প্রেমাস্পদের কর্ণকুহরে অমৃতরস সিঞ্চন করিতে আরম্ভ করে। তাঁহার আদর-সোহাগের একটু কণা লইয়াই তো আমাদের এই জগতের বাৎসল্য ও মধুর রসকে এত মধুর করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার প্রেমদৃষ্টি তাঁহার প্রিয়তম জীবের সমস্ত স্তরগুলি ভেদ করিয়া তাহার আত্মাকে পর্য্যন্ত প্রেমরসে পাগল করিয়া তোলে। সাধক কবিগণ তাঁহাদের সঙ্গীতের মধ্য দিয়া আমাদিগকে সেই দেশের একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

"ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম অপূর্ব্ব শোভন,
ভবজলধির পারে—জ্যোতির্ম্ময়।
শোকতাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন ;
শান্তি পাইবে হৃদয়মাঝে প্রেম জাগিবে অন্তরে,...
কি সুধাময় গান গাইছে সুরগণ, বিমল বিভুগুণ-বন্দনা;
কোটি চন্দ্র-তারা উলসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম।"
"সে কোন জ্যোছনা দেশ সইরে,
যেথা অগণন চকোর মধুপানে বিভোর
নাহি জানে নিত্য সুখ বইরে।

(যেথা) পরাণ সোহাগে চুমে চরণের মূলরে,
প্রাণময়ী ভাষা যথা নাহি তার ভুলরে,
যে দেশের অভিধানে দুখ মানে সুখরে,
তুমি মানে আমি বই আর কিছু নয়রে।
(যেথা) সাকার ডুবিয়া মরে নিরাকার রূপে
নিরাকার ফুটে উঠে সাকার রূপে
নিরাধার মহাপ্রাণ দিবা নিশি জাগে
কই সে দেশ সই কইরে॥"

আমাদের ভাষা এমন কি সাধক কবিদের ভাষাও সেখানকার একটু সামান্য আভাস প্রদান করিতে পারে মাত্র সে যে কি আনন্দ, মনও যে তাহা কল্পনা করিতে পারে না— ভাষা আর কি করিয়া তাহা বর্ণনা করিবে। সে যে কেবল আনন্দই আনন্দ শান্তিই শান্তি—কেবল প্রেম কেবল আনন্দ! কল্যাণে আনন্দে ও মধুর রসে সবই যে সেখানে ভরপুর— সেখানকার সকলেই 'হয়ে বধির-বোবা রসে ডোবা (কেবল) কর্‌তেছে রসের খেলা'। সমস্ত সদ্ভাবের সমস্ত জ্ঞানের প্রেমের আনন্দের পূর্ণ বিকাশ অপূর্ণ মানব-মন কি করিয়া ধারণা করিবে, ভাষায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। সেখানে এখানকার মত কালের প্রভাব নাই তাই সকলেই যুবক—যৌবনজনিত স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য্যে লাবণ্যে ভরপুর। বার্দ্ধক্যের জড়তা রোগের জীর্ণশীর্ণ মলিনভাব ক্ষুৎ-

পিপাসার তাড়না সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। স্বার্থের সংস্কারের কামনা বাসনা আসক্তির পূতিগন্ধ ময়লা-আবর্জ্জনা সেখানে প্রবেশ করিতে অক্ষম। এই সব ময়লা দূর করিয়া চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত করিয়া ভগবৎভাবে ভাবিত করিয়া তারপরে সে দেশে প্রবেশঅধিকার লাভ করা হয়। যখনই কেহ স্থূল দেহ ত্যাগ করে তখনই আমাদের প্রেমময় শ্রীভগবান জীবের পরম ইষ্টতত্ত্ব এবং তাঁহার চিত্রগুপ্ত খুঁজিতে আরম্ভ করেন যে, তাহার জীবনে এমন কোনও ঘটনা আছে কিনা যাহা অবলম্বন করিয়া তাহাকে এই স্বর্গধামে আকর্ষণ করা যায়, পবিত্র আত্মাদের সান্নিধ্যে আস্তে আস্তে শুদ্ধ করিয়া তুলিয়া একটা বিমল আনন্দ উপভোগের সুযোগ দেওয়া যায়। একবার কোনওমতে আনন্দধামে ইষ্ট-সান্নিধ্যে আসিতে পারিলে আর যে মর্ত্তধামে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হয় না, তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তবে যাঁহারা ভগবৎধামে চিরদিন বাস করিবার মত অধিকার লাভ না করেন, তাঁহারা আবার ভগবৎবিধান অনুসারে আপনাদের পরম কল্যাণলাভের জন্য ভবিষ্যতে পূর্ণানন্দ পূর্ণভাবে ভোগ করিবার অধিকারলাভের জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্তধামে প্রেরিত হইয়া থাকেন 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি'। এই স্বর্গধামের সংস্কার তাহাদের চিত্তে সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত থাকিয়া তাহাদিগকে

তাহাদের ভবিষ্যৎ জন্মে মঙ্গলের পথে শান্তির পথে আনন্দের পথে চালিত করিয়া থাকে। যাহারা এই পৃথিবীতে স্থূল দেহে পাপকার্য্যে রত থাকে, তাহাদের প্রতিও ভগবানের মুক্তাত্মাদের অসীম দয়া অপার কৃপা অলৌকিক প্রেম দর্শন করিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়। তাঁহারা যে স্বর্গীয় আনন্দলাভে বঞ্চিত হন কতকটা দুঃখকষ্টের মধ্যে বাস করেন, তাহার ভিতরেও তাঁহারা ভগবানের মঙ্গলময় বিধানকে কল্যাণপ্রদ বলিয়া অনুভব করিবার স্বীকার করিবার ভবিষ্যতে যথাসাধ্য পালন করিবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া জন্মলাভ করিতে উৎসাহিত হইয়া থাকেন। সেই প্রেমময়ের সেই প্রেমিক মুক্ত দূতগণের হাতের শাসনও যে মধুর রসে ভাবে পরিভাবিত হইয়া অপরাধীকে লজ্জিত মোহিত কল্যাণের পথে চালিত করিতে সক্ষম হয়। শাস্তিটাও আনন্দলাভের সামর্থ্যদানে তৎপর বলিয়া আনন্দের সহিত গৃহীত হইয়া থাকে।



* * মনে করিও না মানুষ মরে—আমরা যে সব সেই অজর-অমরের সন্তান। কাপড় বদলান মানে সব শেষ হয়ে যাওয়া নহে। যে যে-কাজ করিতে এখানে আসিয়াছে, তার সে কাজ শেষ হলে সে চলে যাবে। আমরা এখানে তাহাদেরে

মৃত্যু শেষ নহে

যত সুখে যত শান্তিতে রাখি না কেন, সেখানকার সুখ-শান্তির কাছে এসব কিছুই নয়। আমার কি হইবে কি করিয়া চলিবে আমি যে তাহাকে দেখিতে পাইব না, এভাবের কান্না ঘোর তামসিক স্বার্থপরতার লক্ষণ। তাহার দুঃখ-যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে সে সুখে আছে মনে করিয়া আমাদের সুখী হওয়া উচিত। সে গিয়াছে বলিয়া তোমার আর থাকার দরকার নাই তোমার সব কাজ শেষ হইয়া

গিয়াছে এরূপ মনে করিও না। তাহার আত্মীয়স্বজন প্রিয়জন সুহৃদ যাঁহারা রহিয়াছেন—যাঁহাদের সুখশান্তি-বিধানে তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন, তাঁহাদের সেবার কাজ রহিয়াছে। তিনি নিজে প্রত্যক্ষভাবে বেশী কিছু করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তোমার কর্ত্তব্য যে আরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। মনে রাখিবে তিনি তোমার কাছে কি চাহিতেন, তোমার শরীর ভাল থাকে তোমার মনে শান্তি থাকে চিত্ত শান্তিতে ভরপূর থাকে অর্থাৎ তুমি সকলপ্রকারে সুখী থাকিয়া সকলের সুখের সহায় হও, তোমার সম্বন্ধে ইহাই তাঁহার প্রধান ইচ্ছা ছিল। যতদিন তিনি এখানে ছিলেন ততদিন একাজে তোমাকে সাহায্য করিতেন। এখন প্রত্যক্ষভাবে তাহার কিছুই করিতে পারেন না বলিয়া তোমার সম্বন্ধে তোমার আরও দৃষ্টি থাকা উচিত। আবার দেখা হইবে আবার মিলন হইবে ; সে মিলন যাহাতে আরও মধুর হয় তাহার জন্য বিশেষভাবে সাধন করিতে থাক। তোমার চোখে জল দেখিলে তাঁহার কত কষ্ট হইত—এখনো হয়, সেটা ভুলিলে চলিবে না। যদি মনে কর এখন আর তাঁহার কষ্ট হয় না, তবে তুমি নাস্তিক। যাহারা তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে বলে তাহারা তোমার শত্রুর কাজ করিতেছে। প্রকৃত ভালবাসার বিনাশ নাই। ভাবিয়া দেখ তিনি যে তোমাদের ফেলিয়া গিয়াছেন, ইহা

মোটেই তাঁহার ইচ্ছাকৃত নয়। জীর্ণ শীর্ণ ক্লান্ত দেহে ভগবানের প্রিয়কার্য্য-সাধনে বাধা হইত, তাইত প্রেমময় কিছু সময়ের জন্য তাঁহাকে আরও সুন্দর আরও মধুর আরও পবিত্র আরও কার্য্যক্ষম করিয়া পাঠাইবার জন্য তাহাকে তাঁহার প্রেমধামে ডাকিয়া লইয়াছেন। এত পরিশ্রমের পরে কি তোমরা তাহাকে একটু বিশ্রাম করিতে দিবে না? নিজের সুখের জন্য তাহাকে ডাকিয়া ডাকিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহাকে কষ্ট দেওয়া সতী স্ত্রীর কাজ নয়।…আগের ন্যায় কেন তাঁহাকে অনুভব করিতে পার না বা স্বপ্নে দেখিতে পাও না, তাহার কারণ জানিতে চাও? তাঁহার স্মৃতি যখন তোমার কর্ত্তব্য-সাধনের পরমানন্দপ্রাপ্তির সহায় হইবে, তখন আবার ভগবান তাহার সব স্মৃতিগুলি আরো গভীরভাবে তোমার ভিতরে জাগাইয়া তুলিবেন। বিরহটা যে শুধু মিলনকে আরও পবিত্র সুন্দর ও মধুর করিবার জন্য তাহা ভুলিলে চলিবে না। পাওয়াটা সহজ হইলে আমরা অনেক সময় জিনিসের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারি না; তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনাদর করিয়া ফেলি, অন্ততঃ তাহা দ্বারা যতটা উপকৃত হওয়া উচিত ছিল ততটা হই না। এজন্য অনেক সময় একটা সাময়িক বিস্মৃতি ঘটে। একটু চাহিয়া দেখিলে তাহার মধ্যেও মঙ্গলময়ের দক্ষিণ মুখ দেখিতে পাইবে। আমাদের চিত্ত সংস্কারের দ্বারা কলুষিত স্বার্থের দ্বারা

বিকৃত তাই আমরা তাঁহাকে অনেক সময় রুদ্র মনে করিয়া বসি। ইহা ব্যতীত মানুষ এই দেহত্যাগের পরে কিছুদিন আত্মীয়স্বজনদের কাছে মোহবশতঃ একটু বেশী যাতায়াত করে। দেহটা পোড়াইয়া না ফেলিলে হয়ত অনেক সময় তাহার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইবে, আবার সে দেহে ফিরিয়া যাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিবে, তাই ততক্ষণ তাহারা ভাল ভাল আত্মার কাছে গিয়া তাঁহাদের সঙ্গসুখ লাভ করিতে তাহা দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। এজন্য ভগবৎবিধান অনুসারে ভাল ভাল আত্মারা আসিয়া লোকান্তরিত আত্মাদিগকে অনেক সুন্দর স্থানে লইয়া যান, সে সব জায়গার সৎসঙ্গ তাহাদের বিশেষ কল্যাণ সাধন করে। কেহ কেহ বা কর্ম্মানুসারে আবার নূতন জন্ম লাভ করে। যখন মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহ দূরে চলিয়া যায় বা অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে তখন আর পূর্ব্বের ন্যায় তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ব্যতীত অনেক সময় আমরা কাজে অন্যমনস্ক থাকি বলিয়া তাঁহারা কাছে আসিলেও দেখিতে পাই না।

দেখিতে পাইলে কিনা সেজন্য বেশী ভাবিও না। রোজ পূজার সময় ভগবানের কাছে তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করিবে, যাহাতে নিজের জীবনে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পার তাহার জন্য ও বিশেষ চেষ্টা করিবে। জীবনে যত উন্নতি

লাভ করিতে পারিবে ততই তাঁহার দেখা পাওয়া তাঁহার সঙ্গে মেলামেশা সহজ স্বাভাবিক ও মধুর হইবে। তিনি যাহা ভাল বাসিতেন তাহা করিতে থাকিবে, যথাসম্ভব তাঁহার প্রিয়জনদের সেবা করিতে থাকিবে। তোমার সব কাজ দেখিয়া যেন তাঁহার আত্মা সুখী হইতে পারে। তাঁহার মা-বাপ, তাঁহার ভাই-বোন, তাঁহার ছেলেমেয়ে আত্মীয়স্বজন, যাঁহাদের জন্য তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, ভাবিও না এখন ইহাদের কল্যাণ করিতে ইহাঁদের সেবা করিতে তাঁহার আত্মা পূর্ব্ববৎ সচেষ্ট নহে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে তিনি সবচেয়ে বেশী ভালবাসিতেন তোমায় সুস্থ দেখিতে, তোমার সুখ-শান্তি তোমার কল্যাণের সহায় হইতে ; এজন্য তাঁহাকে সুখী করিতে হইলে তাঁহাকে সুখে রাখিতে হইলে নিজের শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। মনটাকে তাঁহার স্মৃতি, ভগবানের স্মৃতি এবং তজ্জনিত সুখ-শান্তি আনন্দ দিয়া ভরপুর রাখিতে চেষ্টা করিবে। নিজের জীবনের কল্যাণ সাধন করিয়া উভয়ের প্রকৃত কল্যাণ প্রকৃত শান্তির সহায় হইবে। ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজনের ভিতরে তিনি অনেকখানি আছেন ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে, ইহাদের সেবার দ্বারা তাঁহার সেবা করিবে। তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে চেষ্টা কর তাঁহার প্রিয় জীবের সেবায় রত থাক, দেখিবে তাঁহার সেবা . করা হইবে

তাঁহার আনন্দের সহায় হইবে। যাহাতে তিনি সুখী হইতেন এখনও তাহাতে তিনি আনন্দবোধ করেন ; তুমি দেখিতে না পাইলেও যে তাঁহার আত্মা তোমার সব কাজ দেখিতেছেন মনের সব ভাব জানিতেছেন।

* * কে তোমাকে বলিল যে তোমার মহারাজা মরিয়া গিয়াছেন ? একটা স্থূল দেহ পরিবর্ত্তন করায় যাহারা সব শেষ হয়ে যাওয়া মনে করে তাহারা যে নাস্তিক ! তাঁহার আত্মা এখনও তোমাদের কাছে বর্ত্তমান থাকিয়া তোমাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তার পরে তিনি এখন তাঁহার ছেলের মধ্যে মেয়ের মধ্যে স্ত্রীদের মধ্যে মন্ত্রীদের মধ্যে প্রজাদের মধ্যে তাঁহার প্রিয় বাগান দালান অনুষ্ঠান-গুলির মধ্যে কি ভাবে কত পরিমাণে রহিয়াছেন তাহা একটু বুঝিতে চেষ্টা কর। তিনি আগে যতটা ছিলেন এখন তার চেয়ে কম আছেন কি বেশী আছেন, তাহা বুঝিয়া লওয়াও যে কঠিন ব্যাপার। ...সেখানে তোমার কাজের আর দরকার নাই এ যে ঘোর নাস্তিকতার কথা। আগে তোমার কাজ তিনি যে ভাবে দেখিতেন যতটা দেখিতেন, এখন যে তার চেয়ে কম দেখিতেছেন একথা তোমাকে কে বলিল ? আগে তাঁহার

দেখাটা ভাবাটা ছিল সংস্কার দ্বারা রঞ্জিত স্বার্থ দ্বারা বিকৃত অভ্যাসবশে কুয়াসাবৃত, এখন তাহা হইয়াছে অনেকটা প্রকৃত অনেকটা শুদ্ধ অনেকটা স্বাভাবিক। তাই তোমার, তোমার কাজের, তোমার সেবার যে এখন আরও বেশী প্রয়োজন হইয়াছে। আগে তাঁর কাজ তিনি করিতেন তোমার কাজ তুমি করিতে ; এখন স্থূলে তিনি যে সব কাজ করিতে পারেন না, তাঁহার দায়ীত্বও যে আসিয়া তোমার ঘাড়ে পড়িয়াছে। তিনি আর নাই, তাঁহার সম্বন্ধে সব কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে— এতটা নাস্তিকতা আমি যে কিছুতেই সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। তোমার গিয়াছে কতটা একটু বুঝিতে চেষ্টা কর। পঁচিশ জনের প্রতি কর্ত্তব্যের মধ্যে এক জনের প্রতি কর্ত্তব্য তোমার মতে একটু কমিয়াছে, আমার মতে তাহাও কিন্তু একটু রূপান্তরিত হইয়া বর্দ্ধিতই হইয়াছে। একটু ভাবিয়া দেখতো তোমার কথাটা তোমার ভাবটা ঠিক, কি আমার কথা ও ভাবটা ঠিক? এই যে কেহ বিধবা হইলে তাহার যেন সব শেষ হয়ে গেল মনে করে, ইহা কি ঠিক? স্বামীর অভাবে তাহার ছেলেমেয়ের শ্বশুরশাশুড়ীর দেবরভাসুরের মা-বাপের আত্মীয়স্বজনের তো আর অভাব হয় নাই, সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের আর আবশ্যকতা নাই মনে করা যে কতটা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক তাহা একটু বুঝিতে চেষ্টা করিও। 'তোমার কেহ নাই একথাটা তাহারা কিভাবে

গ্রহণ করে বলতো ? তাহাদের সেবা গ্রহণ করিবে, তাহাদের উপর নির্ভর করিবে, অথচ তাহাদের সম্বন্ধে কর্ত্তব্যসাধনে উদাসীন থাকিবে, ইহা কিরূপ স্বার্থপরতার হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলতো ?

সে দেশ

* * দাদু,...মা-মাসীদের বাবা—কাজেই দাদু বা দাদা-বাবু। সন্ন্যাসীর আবার একটা সম্পর্ক পাতান দেখিয়া হাসিবেন না। সন্ন্যাসীরাই জানে আসল সম্পর্ক পাতাতে—পৃথিবীর লোকেরা তো সম্পর্ক পাতায় কেবল স্বার্থের খাতিরে। যে আপনাকে চিনেছে নিজেকে চিনেছে সেইতো আপনার সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধটা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে। আমরা যে সব এক মায়ের ছেলে আমরা যে সব ভাই ভাই, ইহা কি সকলে বুঝে সকলে স্বীকার করে ? আমাদের এ সম্পর্কটা আমাদের ভগবানকে লইয়া তাঁহার সেই আনন্দধামের সম্বন্ধ লইয়া সুতরাং ইহা এদেশের নহে, সে দেশের—সেই আমাদের আসল বাসস্থানের সেই আমাদের অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামের। আমরা ছিলাম আনন্দময়ের আনন্দধামে, সংস্কার-দোষে কর্ম্মবিপাকে আমরা শুধু দু'দিনের জন্য

মায়ের লীলাখেলা দেখিতে এদেশে আসিয়াছি ; থিয়েটার দেখা শেষ হলেই আমরা যে দেশের ছেলে সেই দেশে চলে যাব। আমি যেন মানস-চোখে আমার সে দেশটা দেখিতে পাই—সে দেশের পরিচিত আপন-জনদেরে দেখিলেই অমনি চিনিতে পারি। সে যে বড়ই আনন্দের দেশ, তাই সে দেশে যাবার জন্য আমার প্রাণটা যেন সময় সময় ছটফট করিতে আরম্ভ করে। সময় সময় অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ মনে হয়, এ আবার কোথায় এলাম। এ যে রাস্তা ভুলিয়া একটা বিদেশে আসিয়াছি তাহা যেন বেশ বুঝিতে পারি। সে দেশের অমন স্মৃতিগুলি কি এত সহজে ভোলা যায় ? শরীরটা এদেশে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সেদেশে বাস করা যায়। আমার প্রেমাবতার চৈতন্যদেব জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি এদেশে বাস করিতেন বলিয়া আমি কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা সকলেই যে এখন কলিযুগেরই লোক, তাহা আমি মানি না। মনটা যে দেশে থাকিবে সেই দেশেই তো বাস করিব। যার মনটা সত্ত্বগুণে বা গুণাতীত প্রদেশে সে যে সর্ব্বদাই সত্যযুগে বাস করিয়া থাকে। তাঁদের শরীরটা এদেশে আসিয়াছিল এদেশে বাস করিত এদেশে বেড়াইত শুধু এদেশের লোককে সেদেশের খবরটা মনে করিয়ে দিবার জন্য। আমার ভগবানই বোধ হয় তাঁহার জীবের কল্যাণের জন্য ইহাঁদেরে সেদেশের সংবাদ

দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বড় বড় মহাত্মারা যে সেদেশের বার্ত্তাবহ। তাঁহাদের গায়ে সেদেশের গন্ধ মাখা থাকে—তাঁহাদের কথা ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া সেদেশের ভাব আস্বাদ করা যায়। ...আমাকে এবার···পাঠাইয়াছিলেন বোধ হয় আমার দাদুকে একটু সেদেশের খবর দিবার জন্য, তাঁহার প্রাণে সেদেশের জন্য একটু পিপাসা জাগাইয়া দিবার জন্য। ...আমার দিদিমা সাক্ষাৎ দেবী ছিলেন, তাই সেদেশে গিয়া পরমানন্দে বাস করিতেছেন ... সেদেশ হইতে এদেশে কত আনন্দের বারতা শান্তির সংবাদ পাঠাইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সে খবর শুনে কে ? সংসারের লোক সংসারের চিন্তা সংসারে খবর লইয়া এত ব্যস্ত থাকে যে, সে সব কথা তাহাদের কানে যায় না। তাঁদের কথা শুনিবার জন্য তাঁদের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য কিছুদিন একান্তে সাধন-ভজন করিয়া ভিতরের চোখটা একবার খুলিয়া লওয়া দরকার, ভিতরের ইন্দ্রিয়গুলিকে একটু সতেজ ও মুক্ত করিয়া লওয়া দরকার। আগেকার লোকদের কাছে এদেশ ও সেদেশের মধ্যে এমন একটা তামসিক ব্যবধান থাকিত না—এই উভয় দেশের মধ্যে অনেক সময় দেখাশুনা কথাবার্ত্তা ভাব-বিনিময় আদি চলিতে থাকিত। মৃত্যু তাঁহাদের কাছে একটা বিনাশের মত ব্যাপার ছিল না। মৃত্যুকে তাঁহারা একটা কাপড় বদলানর ন্যায় মনে করিতেন। কাজে-

কাজেই তাঁহারা ইহসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িতেন না—পরলোক তাঁহাদের চক্ষে একটা অভ্রান্ত তত্ত্ব বলিয়া বোধ হইত, মৃত্যুকে তাঁহারা মোটেই ভয়ের চক্ষে দেখিতেন না। অনেকে তো মৃত্যুকে সে প্রেমধামের দরজা বলিয়া আদর করিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয়' পদ্যটী স্মরণ করুন,

"যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু তাহারি তুমি সরণি নিশ্চিত,
কোনরূপে অতিক্রম করিলে তোমায়
সফল হইবে আশা যাইব তথায়"।

বলিয়া মৃত্যুকে পরম বন্ধুর ন্যায় মনে করিয়া তিনি তাঁহার পদ্যটী শেষ করিয়াছেন।...মৃত্যুঞ্জয়ের সেবকেরা এখানে থাকিতেই যে মৃত্যুকে জয় করিয়া বসিতেন।...মাদের কলিকাতা বিশেষতঃ দক্ষিণেশ্বর দেখার সংবাদে সুখী হইলাম। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী আমার যে একটী প্রিয়স্থান, আমি ওখানে যাই রামকৃষ্ণদেবের সাধনতত্ত্ব আস্বাদ করিতে। ওখানকার মন্দির দালান বাগান গঙ্গাতীরে যেন তাঁহার সমস্ত সাধন-রহস্য অতি অপূর্ব্ব ভাষায় ভগবৎআদেশে চিত্রগুপ্ত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি কি ভাবে মাকে ডাকিতেন মার সঙ্গে কথা বলিতেন, মা কিভাবে তাঁহার কথার উত্তর দিতেন এবং এইভাবে উভয়ের বাক্যালাপ ও ভাববিনিময়ের

মধ্য দিয়া কি এক অপূর্ব্ব সাধন-তত্ত্ব আনন্দ-লহরী তখন সেখানে খেলা করিত, সেটা যেন এখনও সাধকগণ আস্বাদ করিতে পান, আমি বিশ্বাস করি এখনও সেখানে গিয়া সাধকেরা পরমহংসদেবের সে মা—মা ডাক শুনিতে পান। অমন মধুর ডাক কি প্রকৃতি দেবীর রক্ষা না করিলে চলে? ভাল ভাল গানগুলি কিভাবে প্রকৃতি-তত্ত্ববিদেরা গ্রামোফোনে রক্ষা করেন তাহা আজকাল অনেকেই জানেন। মার প্রধান কর্ম্মচারী চিত্রগুপ্তও গুপ্তভাবে মা ও ছেলের সব সঙ্গীতগুলি মধুর কথাবার্ত্তাগুলি প্রকৃতির আকাশতত্ত্বে লিখিয়া রাখিয়াছেন। সাধকগণ আপন আপন চিদাকাশে মনোনিবেশ করিয়া সে সব রেকর্ডের গানগুলি অতি সুন্দরভাবে শুনিতে পান। প্রকৃতি আপনা হইতেই সে সব রত্নরাজি সযত্নে রক্ষা করেন। আমাদের চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হইলেই আমরা সে সব রহস্য আস্বাদ করিয়া জীবন সার্থক করিতে সক্ষম হই। হিন্দুদের তীর্থস্থানগুলি এজন্য এত বিখ্যাত; সেখানে বড় বড় মহাপুরুষদের সাধনরহস্য সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। সাধকগণ সে সব আনন্দভোগের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন না, কোন তীর্থে কোন সাধক কখন কি ভাবে সাধন-ভজন করিয়া ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া গিয়াছেন প্রকৃত সাধক-ভক্তেরা এখনও সে সব তীর্থে গিয়া তাহা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হন।···আপনার সহধর্ম্মিণী যে সে দিন আপনার

সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ছিলেন না, কে বলিল? আপনাকে একটা অপার্থিব আনন্দরস আস্বাদ করাইবার জন্য তাঁহার সেখানে গিয়া চেষ্টা করাই তো যেন অনেকটা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।...এ সব অবিশ্বাস করা যে একটা ঘোর নাস্তিকতা।...বিরহটা রহিয়াছে মিলনটাকে আরও সুন্দর আরও পবিত্র আরও মধুর করিবার জন্য।...ও সব চোখের জলে চিত্ত ধুইয়া পরিষ্কার হইতে থাকে। আবার মিলন হইবে ইহা বিশ্বাস না করিলে আমি বোধ হয় ভগবানের অস্তিত্বেও অবিশ্বাসী হইয়া পড়িব। আমার ভগবান প্রেমময়, আমি অন্যরূপে তাঁহাকে ভাবিতে পারি না।...তাঁহার উপর রাগ হয়, বেশ প্রাণ খুলিয়া রাগ করুন— অমন অক্রোধ পরমানন্দ আর কোথায় পাবেন? রজনীর 'আমি তো জীবনে চাহিনি তোমারে' গানটা জানেন কি? স্ত্রী পরলোকে গেলে, আসল বাপের বাড়ী গেলে, আনন্দের দেশে ফিরিয়া গেলে যাহারা অমনি তাহাকে ভুলিয়া যায় অমনি তাহাকে ভুলিয়া যাইতে বলে আমি তাহাদেরে বিশেষ অকৃতজ্ঞ মনে করি। আমাদের বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ, উভয়ের ভিতর দিয়া পরস্পর ভগবৎধ্যান ও উপলব্ধির রহস্যটা একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। পরস্পরের মধ্য দিয়া কি ভাবে ভগবান ও ভগবতীকে দর্শন ধ্যান ও

আস্বাদ করিতে হয়, তাহা অতি সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। উভয় উভয়ের কিভাবে জীয়ন্ত ভগবৎবিগ্রহ হইয়া পড়ে, তাহা প্রত্যক্ষভাবে দেখান গুরু-পুরোহিতের একটা প্রধান কাজ ছিল। ভগবান সর্ব্বব্যাপী হইলে কেন যে তিনি আমার স্ত্রী বা স্বামীর মধ্যে থাকিবেন না তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তারপরে ভগবান যখন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ তখন তাঁহার সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ মানুষের ভিতরে যতটা বর্ত্তমান, মানুষের মধ্য দিয়া যত সহজে ফুটিয়া বাহির হওয়া সম্ভব, একটা পাথরের মধ্যে তাহার ততটা স্থিতি ও প্রকাশ আমি ত এত সহজে স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহি।...সাধন-ভজন সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে তাড়াতাড়িতে কোনও কথা বলিবার সুযোগ হয় নাই—সে সুযোগ ঘটিলে আমি তো আপনাকে বুঝাইতে দেখাইতে চেষ্টা করিতাম আপনার ঐ স্ত্রীর ভিতরে ভগবতী কিভাবে বর্ত্তমান, ঐ স্ত্রীর ভিতর দিয়া কিভাবে ভগবতীর ধ্যান ধারণা ও সমাধি দ্বারা আপনার ইষ্টদর্শন ইষ্টপ্রাপ্তি সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িতে পারে। ভগবানের আনন্দধামে গিয়া আপনার স্ত্রী এখন আরও পবিত্র আরও সুন্দর আরও মধুর হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার পার্থিব মাটির দেহ ত্যাগ করিয়া তিনি এখন অতি সুন্দর একটী জ্যোতির্ম্ময় দেহ লাভ করিয়াছেন। সামান্য একটা মাটীর শরীর যে

ভাবে ভগবানকে ভগবৎবিভূতিকে ঢাকিয়া রাখিত, তাঁহার এখনকার জ্যোতির্ম্ময় দেহ আর সে ভাবে ঐ সব ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। ধ্যাননেত্রে তাঁহার এখনকার জ্যোতির্ম্ময় রূপটী একবার দেখিতে চেষ্টা করুন, তাহার মধ্য দিয়া সেই অরূপীর রূপটী সেই ভগবৎভাব-লহরী কি ভাবে ফুটিয়া বাহির হইতেছে তাহা আস্বাদ করিতে চেষ্টা করুন। মানুষের স্থূলরূপের মধ্য দিয়া তাহার ভিতরের ভাবময় রূপটী যে ফুটিয়া বাহির হয়, তাহা বোধ হয় জানেন। আমরা চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের ভিতরের ভাবগুলিকে তত্ত্ব-গুলিকে আমাদের কথা ও কাজের মধ্য দিয়া আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও স্থূলশরীরের মধ্য দিয়া মূর্ত্তিমান করিয়া ফুটাইয়া বাহির করিয়া থাকি। তাঁহার সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময় দেহটীকে এই ভাবে ধ্যান করিতে করিতে আপনার চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হইয়া গেলে তখন তাঁহার ঐ ভাবময় দেহ চিৎঘনরূপে আবির্ভূত হইয়া আপনার জীবন সার্থক করিয়া দিবে।...... শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বিরহভাবকে বেশী ভালবাসিতেন, তাই একদিন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন "সঙ্গম-বিরহবিকল্পে, ন সঙ্গমঃ বিরহোঽপি তস্য, সঙ্গমে একরূপতা বিরহে তন্ময়ং জগৎ"। মিলনের সময় মনটা অনেকটা স্থূল লইয়া স্থূলে সীমাবদ্ধ থাকে, বিরহের সময় মনটা সূক্ষ্মের ভিতর গিয়া অনেকটা স্বরূপের দিকে ছুটিয়া যায়—জগৎকে যেন তখন তন্ময় করিয়া

তোলে। বিরহাবস্থায় প্রিয়জনকে যে তাহার প্রিয়জন ও প্রিয় সামগ্রীর ভিতর দিয়া বেশী করিয়া আস্বাদ করা যায়, তাহা সাধারণ লোকেও অনেকটা অনুভব করিতে পারে। এজন্য যাঁহারা পরলোকগত লোককে ভুলিতে উপদেশ দেন, তাঁহারা তাহার সব স্মৃতিচিহ্নগুলি দূরে রাখিতে বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আত্মীয় হইলেও অজ্ঞাতসারে অনাত্মীয়ের কাজ করিতেছেন। প্রেমানন্দ আনন্দেই আছে আনন্দেই থাকিবে, তার ভগবান যে আনন্দময়। আমাকে আনন্দে না রাখিলে যে আমার ভগবানের চলে না।



এ-লোক ও সে-লোকের মধ্যের ব্যবধানটা কতকটা কার্য্য-কারণ স্থূল ও সূক্ষ্মের ব্যবধানের মত। যাহারা ইহাদের ভিতরকার সম্বন্ধটা অনুভব করিতে অভ্যস্ত তাহাদের চোখে এ-লোক ও সে-লোক অনেকটা কাছাকাছি মনে হয়। আমরা একান্তই স্থূলে সীমাবদ্ধ থাকিতে থাকিতে সূক্ষ্মের অস্তিত্বটা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে যেন ভিতর হইতে কেমন একটা বাধা পাই। প্রায় সময়ই আমরা স্থূল লইয়া থাকি, যখন স্থূল কাছে আসে না তখনও স্থূলের সংস্কারজনিত আসক্তি দ্বেষ কামনা বাসনা সংস্কার আমাদেরে ছাড়ে না। আমরা যেন কেমন একটা স্থূলের স্বার্থপরতার জেলখানায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। স্থূলটাকেও কি আমরা দেখি?

স্থূল ও সূক্ষ্ম

আমরা দেখি স্বার্থের সংস্কারের চশমার ভিতর দিয়া তাহার একটা বিকৃতরূপ।···এখানেই আমাদের দেখা ও ভাবা শেষ হইয়া যায়। গাছের ভিতরে মানুষের ভিতরে আমার স্থূল প্রয়োজনের অতিরিক্ত আর যে কিছু দেখিবার ভাবিবার ও পাইবার আছে, তাহা আমরা চিন্তা করি না—এই ভাবে দেখা-শোনার ফলে আমরা যে কতটা বঞ্চিত হই তাহাও আমরা দেখিতে চাই না। অথচ এই সকলের ভিতরেই সাধক-ভক্ত কত কি দেখিয়া থাকেন। আমরাও জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখি চৈতন্যদেবও জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখিতেন, ইহার ভিতর আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তিনি যাহা দেখিতেন যাহা পাইতেন আমরা তাহা ধারণায়ও আনিতে পারি না। তাই বলিতে হয় আমরা যে স্থূলকেও দেখি না দেখিতে জানি না, দেখিতে অভ্যস্ত নহি; তাই ভগবানের বিরাট মূর্ত্তিকে না দেখিয়া দেখি কেবল কতকগুলি কামনা বাসনা আসক্তির বীভৎস রূপকে। তাই তো জগৎ আমাদের বন্ধনের কারণ। দেখিতে জানিলে এই জগৎই আমাদের মুক্তির কারণ হইত। যে চাকুতে হাত কাটে সেই চাকুই আবার ফল কাটে। "বাসনা এব সংসারস্তন্নাশঃ মোক্ষ উচ্যতে" কথাটার মধ্যে অনেক গভীর সত্য নিহিত আছে। সাধকভক্তগণ জগৎকে ভগবৎবিভূতিভাবে অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থা নির্গুণের সগুণ-

ভাব নিরাকারের সাকার বিগ্রহভাবে দেখেন ভাবেন অনুভব করেন বলিয়াই তো তাঁহারা প্রাণ হইতে এত জোরে বলিতে পারেন, আনন্দ হইতেই জগতের সৃষ্টি আনন্দেই স্থিতি আনন্দেই ইহার আবার লয় হইবে, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে···", আনন্দময় হইতে নিরানন্দ আসিতে পারে না আগুন কখনও ঠাণ্ডা করিতে পারে না। জগৎটা সচ্চিদানন্দের বিলাস-বিভূতি, জগতের সব জিনিসেই তিনি তাঁহার গায়ের গন্ধ মাখাইয়া রাখিয়াছেন—জগৎটা সৃষ্ট হইয়াছে শুধু আমাদেরে তাঁর আনন্দধামে লইয়া যাইবার জন্য। সাধকেরা জগতের প্রত্যেক পদার্থের রূপ-রস-গন্ধাদির ভিতর দিয়া ভগবানের আহ্বান উপলব্ধি করিতে পান। রূপ মাত্রই তাঁহার বিলাস-বিভূতি, শব্দ মাত্রই তাঁহার শব্দব্রহ্মময় বেণুর গীতি। সাধকদের চোখে এই স্থূলটা রহিয়াছে শুধু সেই সূক্ষ্মের দিকে লইয়া যাইবার জন্য—স্থূলটা সূক্ষ্মে যাবার প্রতিবন্ধক নয়। জগৎ ব্রহ্মকে ঢাকিয়া রাখে না প্রকাশ করে। ঢাকিয়া রাখে শুধু তাকে যে স্বার্থপরতার আবরণ দ্বারা নিজের চোখ-কান জোর করিয়া বন্ধ রাখিয়াছে—সেখানেও কিন্তু তাহাকে চোখ-কান খুলিবার জন্য অনুরোধ করিতে তাঁহার বাধা হয় না; আতর সৃষ্টি হইয়াছে নাকের জন্য, যেমন নীলাকাশ চোখের জন্য। এখন যাহারা নাকে

আন্তর দেয় তাহারা নিজেরা আনন্দ পায় অন্যের আনন্দের সহায় হয়, আর যাহারা বিধান না মানিয়া আন্তর চোখে দেয় তাহারা নিজেরা দুঃখ পায় অন্যেরও দুঃখের কারণ হয়। আমরা যদি স্থূলটাকে দেখিতে জানিতাম তবে সে যে আমাদেরে নিজেই সূক্ষ্মের কাছে লইয়া যাইত। তাহার কাজই যে সূক্ষ্মের কাছে লইয়া যাওয়া। আমরা জগৎটাকে দেখি কোথায়—স্থূলে না সূক্ষ্মে? আমাদের দেখা শুনার ভিতরেও যে একটা বাহিরের কম্পন স্থূলের স্পন্দনও আমাদের ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া আমাদের বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী ও পরা আবরণ ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম ও কারণের মধ্য দিয়া গুণাতীত আত্মার নিকট গিয়া পৌঁছায়। আমাদের চঞ্চলতা আমাদের আসক্তি আমাদের স্বার্থপরতাই যে এ তত্ত্বগুলিকে বুঝিতে মনে রাখিতে দেয় না। স্থূল স্পন্দনগুলির কাজই যে আমাদের সূক্ষ্মের ভিতর দিয়া গুণাতীতে লইয়া যাওয়া। ইহারা আমাদেরে লইয়া যাইতে চায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করে ভিতরের দিকে, এখন আমরা জোর করিয়া না গেলে কি করা যায়? আমরা যদি সাধকদের মত এই স্পন্দনগুলি অবলম্বন করিয়া ভিতরের দিকে যাইতে অভ্যস্ত হইতাম, তাহা হইলে আর ভিতর-বাহিরের সূক্ষ্ম-স্থূলের ব্যবধানটা এত কঠিনরূপে প্রতীয়মান হইত না। দরজা খোলা রহিয়াছে অথচ আমরা বাহিরের

দিকে চাহিয়া কেবল চীৎকার করিতেছি—'ওগো, দরজা খোল দরজা খোল'। এতো একটা কম পাগলামির কথা নয়! তারপরে আরও পাগলামি হয় যখন বাড়ীর মালিককে দরজা বন্ধ রাখার জন্য গালাগালি করি। তিনি কতবার বলিতেছেন, 'দরজা খোলা আছে—ভিতরে চলে এস'। তাঁর প্রধান প্রধান ভক্তেরাও এবিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছেন, কিন্তু সে কথা কে শোনে? আমরা যে চাহিয়া আছি বাহিরের দিকে। 'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ' স্বয়ম্ভূ আমাদের সুখের জন্য আমাদের কল্যাণের জন্য বিষয় ও ইন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি জগৎ ও সব ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি না করিলে আমরা তাঁহাকে আস্বাদ করিতে পারিতাম না, তাঁহাকে ধরিবার পাইবার কোনও সুযোগ থাকিত না; কিন্তু আমাদের সংস্কার স্বার্থপরতা আমাদিগকে ঠিকভাবে ভোগ করিতে দেয় না—আমরা যে সেই বাহিরের দিকে ছুটিয়াছি আর একবারও ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখি না 'তস্মাৎ পরান্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্'। যাহারা ধীর অপ্রমত্ত তাহারাই ভিতরের দিকে চাহিয়া সেই দরজা দেখে, দরজা দিয়া ভিতরে গিয়া পরমাত্মাকে পাইয়া সব জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। তাই বলি আমরা যে স্থূলকেও একান্ত স্থূল বুদ্ধিতেই দর্শন করি। আসলে কিন্তু আমরা স্থূলকেও দেখি না, দেখি কেবল আমাদের মায়াকল্পিত স্থূলের একটা বিকৃত রূপকে।

ভূতনাথকে না দেখিয়া দেখি ভূতকে। এদিকে আবার স্থূলটাও যে সূক্ষ্মেরই বহির্বিকাশ, যাহা মনে ছিল তাহারই কার্য্যরূপে বাহিরে প্রকাশ।

ভিতর-বাহিরের সম্বন্ধটা আমাদিগকে একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এজন্য মনটাকে একটু শুদ্ধ ও শান্ত করা দরকার। আমাদের প্রতি ইচ্ছার মূলে অপর কোনও ইচ্ছা লুকাইয়া আছে কিনা তাহা বুঝিতে হইবে। আমাদের ইচ্ছা হইতে কামনা বাসনা আসক্তির কার্য্যকলাপটা বাদ দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। আমাদের দেখা-শোনার ঢংটাও বদলাইতে হইবে। কামনা বাসনা স্বার্থপরতার ভিতর দিয়া দেখিতে গেলে আমরা যে কোনও জিনিসই ঠিক ভাবে দেখিতে পাইব না। যখন বাহিরের জিনিস ভিতরে যাইবে তখন তাহাকে আমরা আমাদের ভাব দ্বারা রঞ্জিত না করিয়া ভিতরে যাইতে দিব, কোথায় কতদূর অবধি যায় তাহা দেখিতে থাকিব। আমাদের সংস্কার আমাদের স্বার্থ যাহাতে তাহাদের যাতায়াতে বাধা না দেয়, তাহাদেরে রূপান্তরিত না করিয়া ফেলে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আবার যখন আমরা ভিতর হইতে বাহিরে আসিব তখনও কোথা হইতে আমাদের ইচ্ছাটা রওয়ানা হইতেছে তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা করিব। বাহিরে যেখানে যাইবে তাহারও ভিতর পর্য্যন্ত অবাধে যাইতে

দিব। এই ভাবে আস্তে আস্তে ভিতরটা, ভিতর-বাহিরের সম্বন্ধটা আমাদের নিকটে ক্রমে পরিচিত হইতে থাকিবে। ভিতর-বাহিরের যাতায়াতের রাস্তাটা স্রোতটা অবলম্বন করিয়া অনেকে সাধনা দ্বারা ভিতরের সব তত্ত্বগুলি আস্তে আস্তে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাস স্নায়বিক ক্রিয়া (Efferent and afferent nervous current) এই সাধনার সহায়। এই ভিতর-বাহিরের খেলার মধ্য দিয়া ভগবানের ভিতরকার অতুল ঐশ্বর্য্য বাহিরে প্রকাশ পায়। ভিতরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লয় এবং বাহিরে আসার সঙ্গে সৃষ্টিরহস্য ধ্যান করিয়া সাধকবিশেষে পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হন। বাহিরে যাইবার সময় আমরা সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে গিয়া সর্ব্বব্যাপী হইয়া পড়ি সর্ব্বত্র আপন আত্মার বিলাসবিভূতি দর্শন করি, আবার ভিতরে আসিবার সময় বাহিরের স্থূলকে নিজের ভিতরে লইয়া সমস্ত বিলাস-বিভূতিকে স্বরূপে লয় করিয়া পরম কৈবল্য-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করি। এই ভাবে শ্বাসের গমনাগমনের সঙ্গে সঙ্গে সাধক-বিশেষে ভগবানের সৃষ্টি ও লয় লীলা আস্বাদ করেন। যখন আমরা প্রিয়জনের কাছে থাকিব তাহাকে স্পর্শ করিব বা তাহার কথা শুনিব, তখন তাহার স্পর্শের বা শব্দের স্রোত আমাদের ত্বক বা শ্রুতির মধ্য দিয়া যাহাতে অবাধে— সংস্কারের স্বার্থপরতার ইন্দ্রিয়-ভোগলালসার বাধা না

পাইয়া ভিতরে চলিয়া যাইতে পারে, এমন কি আত্মা পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিতে পারে তাহার চেষ্টা করিব, কোথায় কতদূর অবধি গেল তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা করিব। 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর প্রাণ' এই মরমে পশার ভাবটা রাধারাণী বেশ আস্বাদ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই শ্যামনাম সূক্ষ্মভাবে তাঁহার ভিতরে কতদূর অবধি গিয়াছিল কি ভাবে বর্ত্তমান থাকিত তাহা বোঝা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর ছিল না। স্থূলের সব স্রোতগুলি অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া আস্তে আস্তে শ্রীরাধাকে যেন কৃষ্ণময় করিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা যদি আমাদের প্রিয়জনের স্থূল স্পর্শাদির মধ্য দিয়া সূক্ষ্ম ভাবগুলি কিভাবে আমাদের ভিতরে যায় কিভাবে আমাদের ভিতরে বাস করে তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে তাহার সূক্ষ্ম রূপটাও তখন আমাদের নিকট আস্তে আস্তে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে, আমাদের ভিতরকার সূক্ষ্ম রাজ্যটাও তখন ধীরে ধীরে আমাদের সম্মুখে ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে। ইহারই পরিণামে আমরা বুঝিতে সক্ষম হই, সূক্ষ্ম রাজ্যটা কত সুন্দর কত উজ্জ্বল কত সত্য! আমরা বুদ্ধির দোষে সূক্ষ্মজগতে প্রবেশের রাস্তাটাও বন্ধ করিয়া রাখি।

তারপরে মনে রাখিতে হইবে এই স্থূলে পাওয়াটার মানে কি? স্থূলটাকে পাওয়া না স্থূলের মধ্য দিয়া আর কাহাকেও

পাওয়া ? সাধকেরা অনুভব করিয়া থাকেন যে আমরা যাঁহাকে পাই যিনি আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, তিনি স্বরূপতঃ স্থূল-সূক্ষ্মেরও অতীত। ইহাদের ভিতর দিয়া তিনি আপনাকে প্রকাশ করেন, কিন্তু ইহাদের রংএ কতকটা রঞ্জিত হন বলিয়া আমরা তাঁহাকে ইহাদের সঙ্গে অভেদ মনে করিয়া তাঁহাকে যে পাইতেছি তাহা না ভাবিয়া না বুঝিতে পারিয়া স্থূল ও সূক্ষ্মকে পাইতেছি মনে করিয়া বঞ্চিত হই। আমি কে আমার শরীর কি ইহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিনা বুঝিতে চেষ্টাও করিনা। শরীর আদি যে আমাকে প্রকাশ করিবার যন্ত্রবিশেষ উপায়বিশেষ, ইহাদের ভিতর দিয়া যিনি প্রকাশ পান তিনি যে আমার আত্মা; ইহাদের ভিতর দিয়া লোকেরা যাহাকে পায় যাহাকে আস্বাদ করে তাহাও যে সেই আত্মা তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। আত্মায় অনাত্মার ধর্ম্ম, অনাত্মায় শরীরাদিতে আত্মার ধর্ম্ম অধ্যস্ত করিয়া আমরা মনে করি শরীরটা আমাকে আনন্দ দিতেছে—শরীরটাই আমার ভালবাসার পাত্র। যিনি ইহাদের মধ্য দিয়া আমাদের আনন্দ দেন আমাদের আনন্দ দিতে ব্যস্ত, তাঁর কথা একবারও আমরা মনে করিনা তাঁর দিকে একবারও আমরা চাহিয়া দেখিনা। এই ভাবে আমরা যেন একেবারে দেহসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছি। স্থূল দেহটাকেই সব জানিয়া

সার ভাবিয়া ভিতরের প্রকৃত সার পদার্থ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। তাই স্থূলটা দূরে গেলে আমাদের সব গেল, স্থূলটা বিনষ্ট হইলে সবটা নষ্ট হইল আর কিছু বাকী রহিল না ভাবিয়া আমরা অস্থির হইয়া পড়ি। ভিতরের রাজ্যটা সূক্ষ্ম ভাবটা আনন্দময়ের অনেকটা বেশী কাছে বলিয়া বেশী আনন্দদায়ক, তাই প্রেমময় ভগবান স্থূল হইতে আমাদেরে সূক্ষ্মের দিকে টানিয়া লইয়া একটু বেশী ভাবে আনন্দ ভোগ করাইতে ব্যস্ত হন। কিন্তু স্থূলে আমরা অনেকটা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ায় সূক্ষ্মরাজ্যে প্রবেশ করা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। স্থূলের ভিতর দিয়া সূক্ষ্মের দেশে যাওয়ার যে রাস্তা, সেটাও যেন আমরা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি। এইজন্য ভগবান আমাদিগকে তাঁহার সূক্ষ্মতত্ত্ব আস্বাদ করাইবার জন্য স্থূলে সীমাবদ্ধ প্রিয় বস্তুকে স্থূল হইতে সরাইয়া লইয়া স্থূলের অসারতা এবং সূক্ষ্মের নিত্যতা হৃদয়ঙ্গম করাইতে চেষ্টা করেন। তখন স্থূলের অন্তর্ধানকে সূক্ষ্মেরও অন্তর্ধান মনে করিয়া আমরা এতটা অস্থির হইয়া পড়ি যে, ভিতরে কিছু রহিয়া গেল কিনা স্থূলের নাশে সব নাশ পায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবারও আমরা অবকাশ পাইনা। দেখিবই বা কি করিয়া—যে মন চিন্তা করিবে সে যে তখন শোকে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। চঞ্চল চিত্তে

স্বরূপদর্শন সত্য অবধারণ যে অসম্ভব। স্থূলের নাশে সব নাশ হয়, এইরূপ ভাবার পরিণামেই তো আমরা মৃত্যুকে এতটা ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি; নতুবা স্থূলের যেখানে লয় স্থূলের যেখানে মৃত্যু সেখানেই যে সূক্ষ্মের প্রকাশ আরম্ভ। এই তত্ত্ব অনুভব করিয়াই তো সাধকেরা শ্মশানকে এত ভালবাসেন। মা আদ্যাশক্তি বাবা ভোলানাথ যে শ্মশানকে বড়ই ভাল বাসেন। আমাদের হৃদয়কে শ্মশানে পরিণত না করিতে পারিলে সমস্ত কামনা বাসনা সংস্কার আসক্তি দেহাত্মবুদ্ধিকে জ্ঞানাগ্নিতে পুড়াইয়া ছারখার করিতে না পারিলে যে আমাদের ভিতরে জগতের ভিতরে ভগবানের লীলারহস্য অনুভব করা প্রায় অসম্ভব। বুদ্ধদেবের শূন্যবাদের মধ্য দিয়াও যে আমরা এই তত্ত্ব বেশ সুন্দর ভাবে আস্বাদ করিবার সুযোগ পাই। মৃত্যুকে কেন যে সূক্ষ্ম-রাজ্যের ভগবৎধামের সরণি বলা হইয়াছে তাহা সাধক মাত্রেই বিশ্বাস করিতে বাধ্য। এই মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া জয় করিয়া আমাদের মৃত্যুঞ্জয়ের দর্শন লাভ করিতে হইবে। "কোনরূপে অতিক্রম করিলে তোমায়, সফল হইবে আশা যাইব তথায়"।

মৃত্যুকে আমরা বুদ্ধির দোষে ভয়ের কারণ মনে করিয়া বসিয়াছি বলিয়া ভগবান তাহা অপেক্ষা ছোট মৃত্যুকে কতকটা বিরহের বেশে আমাদের সম্মুখে

উপস্থিত করিয়া আমাদের কল্যাণ সাধন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ভগবান বিরহের মধ্য দিয়া তাঁহার সূক্ষ্ম রাজ্যটী তাঁহার প্রিয় সাধক-ভক্তদের নিকট প্রকাশ করিবার সুযোগ পান। মিলনের সময় আমাদের অনুভূতি প্রিয়জনের স্থূল রূপে স্থুল ভাবে অনেকটা সীমাবদ্ধ থাকিতে চায়, বিরহের সময় তাহাদের স্থূল দেহটা দূরে থাকে সূক্ষ্ম রূপটা স্মৃতিরূপে হৃদয়ে লুকাইয়া থাকিয়া বাহিরে প্রকাশ পাইতে ফুটিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করে। তখনও অন্যান্য স্থূল সংস্কারগুলি একাজে বাধা দিতে আরম্ভ করে। 'হৃদয়ে রেখেছি মূরতি লিখি বাসনা হইলে চাহিয়া দেখি' ইহা সাধনরাজ্যের অনুভূত সত্য। "বলাদাকৃষ্য নির্যাতি কিমু কৃষ্ণ তদদ্ভুতং। হৃদয়াদ্ যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥" বিল্বমঙ্গলের এই তেজ সাধকদের আস্বাদনের বিষয়। সর্ব্বশক্তিমান ভগবানও যে ভক্তহৃদয় হইতে দূরে যাইতে অক্ষম, ইহা প্রকৃত ভক্তের ঐ উক্তিতে বেশ আস্বাদ করা যায়। প্রিয়জন যখন আমাদের কাছে থাকেন তখন তাহাকে পাওয়াটা আমরা যদি স্থূলে সীমাবদ্ধ না করিয়া ফেলি, তবে তাহাকে সূক্ষ্মভাবে ও কারণভাবে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরকার সূক্ষ্ম ও কারণ-ভাবও তখন আমাদের অনুভবে আসিতে চেষ্টা করিবে, তখন ঐ সূক্ষ্মরাজ্যও যে আমাদের নিকট আস্তে আস্তে খুলিয়া প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিবে।

এ অবস্থায়* স্থূলে না পাওয়ার সময় প্রিয়জনের বিরহটা এই সূক্ষ্মভাবে পূর্ব্বানুভূত পাওয়ার পুনর্বিকাশরূপে আমাদের আনন্দের সহায় হইয়া থাকে। ভিতরে পাওয়া গভীরভাবে পাওয়া, তাহার সংস্কারও যে বেশী স্থায়ী হইয়া থাকে। ইহার ফলে আমাদের প্রিয়জন আমাদের নিকট শুধু স্থূলে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকেন না, দূরে থাকিয়াও এ অবস্থায় আমরা তাঁহাদের মনের ভাব সূক্ষ্ম অস্তিত্ব বেশ সুন্দর ভাবে অনুভব করিতে পারি। একবার প্রিয়জনদের সূক্ষ্ম রূপটা ভাবময় দেহটা আমাদের চোখে পড়িলে, তার পরে কেহই—এমন কি, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহাকে দূরে লইয়া যাইতে পারেনা। মৃত্যু লইয়া যায় স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, সুতরাং জীবিত অবস্থায় যাঁহারা প্রিয়জনের সূক্ষ্মদেহ দেখিতে অভ্যস্ত সূক্ষ্মভাবে তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিতে সক্ষম, মৃত্যু তাঁহাদের নিকট কোনও ভয়ের কারণ বলিয়া অনুভূত হয় না। শ্রীরাধা এজন্য শ্রীকৃষ্ণের বিরহভাবকে বেশী কল্যাণপ্রদ বেশী সুখদ মনে করিয়াছিলেন। "সঙ্গম-বিরহবিকল্পে ন সঙ্গমঃ বিরহোঽপি তুসা, সঙ্গমে একরূপতা বিরহে তন্ময়ং জগৎ" কথাটা রাধাপ্রেমের গভীরতা জ্বলন্তভাবে ঘোষণা করিয়া থাকে। বিরহাবস্থায় সূক্ষ্ম ভাবটা বেশী দৃষ্ট হওয়ায় প্রিয়-জনের সর্ব্বব্যাপিত্ব তখন সহজেই অনুভব করা যায়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁহার জীবনের শেষ আঠার বৎসর

কঠোর বিরহভাবের সাধনা দ্বারা তাঁহার ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে সূক্ষ্মভাবে এমন করিয়া পাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের পূর্ণ মিলন তখন পূর্ণ স্থায়ী ভাব লাভ করিয়াছিল। জাগতিক সব ব্যবধান দূর হওয়ায় এদেশ-ওদেশের ভিতরকার সব ব্যবধান দূর হওয়ায়, চৈতন্যের আত্মা তখন স্থূলের সূক্ষ্মের দেশগত ভেদভাব দূর করিয়া ব্রহ্মধামে ব্রহ্মভূত হইয়া তাঁহার প্রেমাস্পদের সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া গিয়াছিলেন। বিরহ মিলনকে স্থায়ী করে পাকা করে মধুরতর করে। যাঁহারা ওপারে গিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটাইবার জন্য সেই মহা-প্রেমিক যে মহা ব্যস্ত। এ বিরহ আমাদের নিকট যতটা অসহ্য তাঁহার নিকট যে তদপেক্ষা অনেক বেশী অসহ্য। যার প্রেম যত বেশী তার বিরহ-বোধও তত বেশী, সুতরাং সেই বিরহ দূর করিয়া মিলনসাধনে তিনি তত বেশী ব্যস্ত। আমাদের প্রিয়জনেরা সেখানে গিয়া সে দেশের বারতা এদেশে পাঠাবার জন্য সে দেশের আনন্দ এদেশের আত্মীয়-দেরে আস্বাদ করাইতে কত ব্যগ্র তাহা এদেশের লোকেরা বুঝিতে পারে না।

** আমার সেই লুকানো মা সকলের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতে আপনাকে ধরা দিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত; আমরা ঠিক ছেলে হইতে পারিলেই যে তাঁহার প্রকাশ সহজ হইয়া পড়িবে। আমাদের কথা ভাব ও কাজ যেন মার প্রকাশের মার আগমনীর রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দেয়।

……মার সুখের সহায় হইতে গিয়া যদি আমার কষ্টে বুক ফাটিয়া যায়, তাতেও যে আমার আনন্দ; তবে ঐ ভাবে বুক ফাটা বা কষ্ট হওয়া অসম্ভব। তাঁর জন্য যে কষ্ট করা যায় তাহা কখনই যে কষ্টের কারণ হইতে পারে না। আমাদের সাধনা হইবে তাঁহাকে সুখী করা তাঁহাকে আনন্দ দেওয়া……মার ইচ্ছা পূর্ণ করা মার কাজের সহায় হওয়াই তো আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমি কিন্তু সব কাজের ও ভাবের মধ্য দিয়া আমার মাকে বেশী করিয়া পাইয়া থাকি।

……তোমার বাবাকে বুঝাইয়া দিও যে আমাকে বিরক্ত করা তাঁর ক্ষমতার অতীত। আমি আমার মার কোলে বাস করি, আমার দৃষ্টি থাকে আমার মার মুখের দিকে, আমার বল-ভরসা তাঁহার আশীর্ব্বাদ। আমার সুখ-শান্তি কল্যাণের জন্য ব্যস্ত আমার আসল মা, সুতরাং আমাকে দুঃখ দেয় কার সাধ্য।……

* * আমার কি মজা বলতো? আমার ভগবানের যে আমাকে সুখে না রাখিলে চলে না—তিনি আমার কল্যাণের জন্ম আমার সুখের জন্ম ব্যস্ত, বল তো আমার কি সুখ!...... আমার কোলে ছোট মেয়েটীর মত ঘুমাইয়া পড়িতে চাও তা' ঘুমাও, আমিও কিন্তু তখন আমার মার বুকে মাথা রেখে ছোট্ট ছেলেটীর মত আনন্দে ঢলিয়া পড়িব; আর তখন বাবাও যে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া আমাদের প্রেমময়ের আনন্দলীলা আস্বাদ করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইয়া যাইবেন—তখন জগৎ কি মধুর মনে হইবে বল তো!...... আমার কথা শুনিবে, সে কি শুনিতে পাও না? আমি যখন আকাশের ভিতর দিয়া পাখীর ভিতর দিয়া গাছের ভিতর দিয়া আমার ভগবানের সঙ্গে কথা বলি, তখন কি সে কথা তোমরা শুনিতে পাও না? সে কথার যে অনন্তপ্রসার! তাহা কি তোমাদের ওখানে পৌঁছায় না? পৌঁছায় নিশ্চয়ই, তবে একটু শোনাও তো চাই। অন্য দিকে মন থাকিলে কি আর সে সব কথা শোনা যায়? একটু শুনিতে চেষ্টা করিও।.....আজকাল কিন্তু আমার সেই লুকানো মার সঙ্গে আমার খুব লুকোচুরি-খেলা চলে। তিনি লুকালে কি হয়, এদিকে যে টু' দিয়ে ধরা দিবার জন্ম কত ব্যাকুল! ডাকের বিরাম নাই—আমার সুখের জন্ম সর্ব্বদা সচেষ্ট, আমার কোথাও অসুবিধা হইবে, অকল্যাণ হইবে,

কষ্ট হইবে ইহা কি তিনি সহ্য করিতে পারেন ? আমি ঠিক ছেলে হ'তে পারলেই তাঁহার প্রকাশ তাঁহার আবির্ভাব সহজ হইবে। আমাদের সকলের মিলিত চেষ্টা আমাদের মার আগমনীর মার বিকাশের সূচনা করিয়া দিবে। আমরা আমাদের জীবন দ্বারা আমরা আমাদের সাধনা দ্বারা আমরা আমাদের কথা ভাব ও কাজের দ্বারা আমাদের মার আবি-র্ভাবের রাস্তা সহজ করিয়া দিব। নতুবা ছেলে কোন্ কাজের ? মার ইচ্ছা পূর্ণ করা মার কাজের সহায় হওয়া মাকে আনন্দে রাখাই তো মার ছেলের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি তো আমাদের সাহায্য করিতে মহা ব্যস্ত— তবে আমরা তাঁহাকে সাহায্য করিবার সুযোগ দিই কোথায় ? আমাদের কথা ভাব ও কাজ কি তাঁহার ইচ্ছার অনুকূল ?……তবে সেজন্যও কিন্তু আমি ভাবি না। "আমি চিনি না জানি না কিছুই বুঝি না তথাপি তোমারে চাই, আমার আছেন জননী এইমাত্র জানি আর কোন জ্ঞান নাই,… একবার ডুবিব অতলে মহাসিন্ধু-নীরে যা থাকে কপালে ভাই।"……আমি সময় সময় যেন জ্ঞানকে একটু ভয় করি, জ্ঞানটা হ'লেই বাবারা হয়তো চাকরী করিবার জন্য মার কাছ থেকে দূরে পাঠাবার জন্য ব্যস্ত হবেন, যদিও জানি দূরে পাঠান অসম্ভব। মা যে আমার সর্ব্বব্যাপী ! "তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।" আমার

মা যখন সর্ব্বব্যাপী তখন আমারও যে সর্ব্বত্র যেতে হবে সকলকে পেতে হবে সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে; নতুবা কি সর্ব্বগত মাকে সর্ব্বভাবে পাওয়া যায়? 'সর্ব্বতঃ প্রাপ্য' সোজা কথা নয়। শুধু সাধু-মহাত্মাদের মধ্যে পেলে চলবে না, চোর ডাকাত গুণ্ডার ভিতরে বাঘ ভাল্লুক সাপের ভিতরেও তাঁহাকে দেখিতে হইবে পাইতে হইবে ধরিতে হইবে। শুধু আনন্দের মধ্যে পেলে চলিবে না, রোগের মধ্যে শোকের মধ্যে বিপদের মধ্যে দুঃখের মধ্যে—এমন কি, নিজের ও আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর মধ্যেও তাঁহাকে দেখিতে হইবে পাইতে হইবে আনন্দময়ী বলিয়া আনন্দের সহিত বরণ করিতে হইবে। "তুমি চিতানল হও আমি পুড়ে মরি হে, আমি যাব না তোমায় ছেড়ে আর, আমি বাঁচি না তোমায় ছেড়ে আর" একি সহজ কথা। বেশ করে তাঁর নামগান কর আমি এখান হ'তে শুনব। তাঁর নামের যে সর্ব্বত্র অবাধ গতি, দূরের দূরত্ব মানে না—শুনতে ইচ্ছা হ'লেই শোনা যায়। অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাকি শুনতে হয়!··· আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—কেবল মনে হচ্ছে বৃষ্টি নামবার আগে সে এসে পৌঁছিলে হয়। আমি কি পাগল! "সে যে কাছে এসে বসে আছে তবু দেখিনি"—একটু আরাম কর্ত্তে দাও। "যাই গো ঐ বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে"—আমার যে আর না গেলেই নয়।






❋❋ প্রথমতঃ দেখা যাউক মৃত্যু জিনিসটা কি। মৃ ধাতু হইতে মৃত্যু-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মৃ ধাতুর অর্থ রূপান্তরিত হওয়া কারণে লয় হওয়া পরিণাম ভজনা করা। মৃত্যু ও বিনাশ একই ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্র বর্ত্তমান বিজ্ঞানশাস্ত্র নষ্ট হইয়া যাওয়া আদৌ বিশ্বাস করেন না। পরমাণু নিত্য পদার্থ। কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়, কার্য্য আবার কারণে লীন হইয়া যায়। তাই বলা হইয়াছে 'বিনাশঃ কারণে লয়ঃ'। আমরা যখন বলি 'গাছটা নষ্ট হইল' 'ঘরটা ভাঙ্গিয়া গেল', দার্শনিক পণ্ডিতগণ তখন বলেন 'গাছের ও ঘটের পরমাণুগুলি যে কারণ হইতে যে পঞ্চভূত হইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আবার লয় হইয়া গেল'।

গাছটা তৈয়ার করিতে পঞ্চভূতের নিকট হইতে ক্ষিতি অপ তেজ আদির পরমাণুগুলি ধার করিয়া আনা হইয়াছিল। যতদিনের জন্য আনা হইয়াছিল ততদিন রাখা হইয়াছে, এখন ঋণশোধ করিবার ঋণ মুক্ত করিবার দিন আসিয়াছে; তাই যাহার নিকট হইতে যাহা আনা হইয়াছিল মৃত্যুর দিনে আবার তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে। ইহার মধ্যে যিনি ঘট বা গাছ সম্বন্ধে অনাসক্ত, তিনি ঋণশোধ হওয়ায় ঋণমুক্ত হইবার সুযোগ পাইয়া আনন্দানুভব করেন; আর যিনি ঘটে বা গাছে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি ঋণমুক্ত হইলেও আসল তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া গাছের বা ঘটের অভাবজনিত দুঃখে অধীর হইয়া কষ্ট অনুভব করেন। দুঃখভোগের কারণ ঘট বা গাছের বিনাশ নয়। যদি এই বিনাশ দুঃখের প্রকৃত কারণ হইত, তবে অনাসক্ত পুরুষও ইহা হইতে দুঃখভোগ করিতেন। "যদসত্ত্বে যদসত্তা যৎসত্ত্বে যৎ সত্তা তদেব তস্য কারণম্" যাহার সদ্ভাবে যাহার অস্তিত্ব যাহার অসদ্ভাবে যাহার অনস্তিত্ব সেইই তাহার কারণ। ঘট বা গাছের অভাবে যখন অনাসক্তের দুঃখ জন্মিল না, তখন ঘটের বা গাছের নাশ দুঃখের প্রকৃত কারণ নহে; দুঃখের কারণ হইয়াছে ঘটে বা বৃক্ষে অত্যাসক্তি। যাহারা অসাধক তাহারা যাহা দেখে শুনে ভোগ করে, তাহার সংস্কার তাহার দাগ তাহার

ছাপ তাহাদের চিত্তে লাগিয়া থাকে; সেজন্য উক্ত ভোগ্য পদার্থের মধ্যে যাহা অনুকূল-বেদনীয় তাহা পাইতে এবং যাহা প্রতিকূল-বেদনীয় তাহা ছাড়িতে তাহাদের ইচ্ছা হইয়া থাকে। যাঁহারা সাধক যাঁহারা সিদ্ধ তাঁহাদের চিত্ত কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হওয়ায় এসব ভোগ্য পদার্থ তথায় কোনও দাগ বা সংস্কার রাখিয়া যাইতে পারে না; সুতরাং তাঁহাদের চিত্তে এসব পদার্থের জন্য আসক্তি বা দ্বেষের ভাব পরিলক্ষিত হয় না।

এখন দেখা যাক, এই আসক্তি এই সংস্কারের দাগ ভাল কি মন্দ। মহাভারতে দ্রোণাচার্য্যকে 'সংস্কার'-রূপে দেখান হইয়াছে। তিনি কুরুপাণ্ডব প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি উভয় পক্ষেরই গুরু। সংস্কারের সাহায্য ব্যতীত ভাল-মন্দ কোন বিষয়েরই শিক্ষালাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে; কিন্তু তবুও পরিণামে ভগবৎ-প্রাপ্তিতে সংস্কার বাধা দিয়া থাকে। ভগবৎতত্ত্ব সংস্কারের অতীত, সংস্কাররঞ্জিত চিত্তে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বিত অনুভূত হইবার নহে। তাই অর্জ্জুনকেও একদিন গুরু দ্রোণের বধের কারণ হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক প্রথমাবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজন থাকিলেও, উন্নতাবস্থায় সংস্কার হইতে মুক্তিলাভ করা সাধক মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। শান্ত চিত্তে বিচার করিলে সংস্কার ততটা বন্ধনের কারণ নহে; সংস্কারজনিত আসক্তিই বন্ধনের কারণ। এই যে

যাহা ভাল লাগিল তাহা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা, ইহা যে একান্তই আসক্তিমূলক। সংসারের কোন জিনিসকেই তো এইভাবে ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই, সংসার জগৎ মানেই যে যাহা পরিবর্ত্তিত হয়—যাহা রূপান্তর ভজনা করে। যাহার স্বরূপ অসৎ পরিবর্ত্তনশীল তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে কখন কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে না, তাহাতে আসক্ত হইলে দুঃখ অনিবার্য্য। জগতের আমাদের দেহের জাগতিক প্রত্যেক পদার্থের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতেছে—প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুকে ভজনা করিতেছে। কোনও দেহ কোনও পদার্থ আমূল পরিবর্ত্তিত না হইলে আমরা তাহাকে পরিবর্ত্তন বলিয়া ধরিতে পারি না, এটাও যে আমাদের বুঝিবার ভুল। যে যাইবে যাওয়া যাহার স্বভাব যাইতে যে বাধ্য, তাহাকে স্বার্থের জন্য ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে আমাদের হতাশ হওয়া দুঃখবোধ করা অনিবার্য্য। সুতরাং যাহা দেওয়া জিনিস, যাহা ছাড়িতে হইবে—দেওয়াতেই যাহার সার্থকতা, তাহাতে আমরা যদি অনাসক্ত থাকিয়া কাড়িয়া লওয়ার আগেই দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারি, যেখানে সেখানে না দিয়া আমাদের পরম প্রেমাস্পদকে দিয়া দিতে পারি, যাঁহাকে দিলে দেওয়া সার্থক হইবে দানটা সৎপাত্রে প্রকৃত মালিকের কাছে গিয়া পৌঁছিবে

তাঁহাকে দিয়া দিতে পারি, তবে আর আমাদের এমনভাবে অপমানিত হইতে হয় না—এতটা কষ্ট পাইতে হয় না; বরং ইচ্ছাপূর্ব্বক দান করিতে সক্ষম হওয়ায় আমরা কতকটা আনন্দভোগ করিবার সুযোগ পাই।

জগৎটা সৃষ্টি করা হইয়াছে আমাদের ভোগের জন্য, চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় দেওয়া হইয়াছে এই ভোগকে সার্থক করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে; সুতরাং দেখিব শুনিব যথাসম্ভব উপভোগ করিব, সকলকে ভালবাসিব আদর করিব সকলের কল্যাণসাধনে যথাসম্ভব চেষ্টা করিব—ইহার মধ্যে ইন্দ্রিয়ের বন্ধনও নাই, দুঃখের কারণ নাই; যত আপত্তি ইহাদের উপর আসক্তি রাখিতে ইহাদেরে আমার বলিয়া ধরিয়া রাখিতে আমার বলিয়া সীমাবদ্ধ করিতে। গাছটা দেখিব আকাশটা দেখিব—সুবিধা হইলে মানুষটাও দেখিব—ইহাতে বন্ধন নাই; কিন্তু দেখিবার লোভ দেখিবার আসক্তি যখন দেখার প্রতিবন্ধক হইলে অশান্তির সৃষ্টি করে, দৃশ্য পদার্থকে আমার বলিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়, তখনই তো যত গোলমাল। এইজন্যই বোধ হয় সাধনা দ্বারা আসক্তিবর্জ্জিত হইবার আগে দেখা শুনা ভোগ করার সম্বন্ধে একটা বিচারের একটা বিধিপালনের উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অসঙ্গ 'অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ', তাই আত্মাকে অসঙ্গ রাখাই ভগবানের উদ্দেশ্য এবং আমাদেরও কর্ত্তব্য।

তাই বোধ হয় আমাদের প্রিয় বিষয়গুলিকে কাড়িয়া লইয়া দুঃখের ভিতর দিয়া আমাদিগকে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ করিতে তাঁহার এত চেষ্টা। আত্মা সর্ব্বগত, তাহাকে একটা দেহে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিব ইহা তিনি সহ্য করেন না ; তাইতো যাহাকে নিজের দেহ বলিয়া এত আদর-যত্ন করি, তাহাকেও তাঁহার কাড়িয়া লইতে হয় বদল করাইতে হয়। বার বার আঘাত পাইয়া আমাদের দেহাধ্যাস দেহে অত্যাসক্তি কমিতে আরম্ভ করে। যাহা আমার নয় যাহা একদিন আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে, যাহাকে ছাড়িয়া যাওয়াই আমার কাজ, পরিবর্ত্তিত হওয়াই যাহার ধর্ম্ম, তাহাকে ত্যাগ করিতে শিক্ষা করা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকা তাহাতে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত থাকাই যে শান্তির উপায়। "ত্যাগাৎ শান্তি-রনন্তরম্"। বিষয়কে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করায় বিষয়কে ধরিয়া রাখিবার জন্য এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করায় প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া বিষয়কে ধরিয়া রাখিতে উদ্যোগ করায়, কষ্ট-ভোগ অশান্তিভোগ ছাড়া সুখের কোনও আশা নাই। বিষয় যে বিষয়ই—বিষয়কে ছাড়িয়া দিয়া বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ করিয়া শ্যেনপক্ষী শান্তিলাভ করিয়াছিল, বিষয়ের আশা ভোগের আশা ত্যাগ করিয়া পিঙ্গলা সুখী হইয়াছিল "নীরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ"। গীতাকার দেখাইয়াছেন, বিষয়-ইন্দ্রিয়সংযোগজনিত সুখ দুঃখেরই কারণ, ইহা আগমাপায়ী

ও অনিত্য; ইহাকে সহ্য করা ছাড়া ইহাতে আসক্তি ত্যাগ করা ছাড়া শান্তির আশা সুদূরপরাহত। শরীরটাও বিষয়, শরীরটাও পরিবর্ত্তনশীল বিনাশধর্ম্মী, ইহার সম্বন্ধেও উদাসীন হইতে হইবে অনাসক্ত হইতে হইবে। আমি যে দেহ নই, এই দেহের পরিবর্ত্তনে আমার যে কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় না, আমি যে এই দেহসম্বন্ধে দেহের সুখদুঃখ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন অসঙ্গ অনাসক্ত থাকিতে পারি, উদাসীন অনাসক্ত থাকাই যে আমার স্বভাব—তাহাই অর্জ্জুনকে সর্ব্বপ্রথমে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

যাহারা দেহাতিরিক্ত আত্মায় বিশ্বাসী সেই সব আস্তিককে মৃত্যু সহজে বিচলিত করিতে পারে না; আর যাহারা দেহেই দেহাত্মবুদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ, দেহাতিরিক্ত আত্মার কোনও সন্ধান পান নাই কোনও সন্ধান রাখেন না, দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, মৃত্যু তাঁহাদেরে বিশেষভাবেই বিচলিত করিয়া ফেলে। আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেওয়া কঠিন ব্যাপার। এজন্য আস্তিক যেমন শান্তিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন নাস্তিক তেমন পারেন না। তাঁহার যাহা কিছু সবই যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নাশ পাইবে, কিছুই বাকী থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস করিতে তিনি অভ্যস্ত নহেন।

হিন্দুশাস্ত্রে ভগবান হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, স্থিতি

ভগবানে আবার লয়ও হইবে ভগবানে। সৃষ্টির অতীত অবস্থাটাকে একটু বেশী আদরের বেশী লোভনীয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। আমাদের স্থিতি যদিও ভগবানেই, তবুও যে কারণেই হউক যার দোষেই হউক স্থিতির সময়টা আমরা যেন একটু ভগবানকে ভুলিয়া তাঁহা হইতে আপনাদেরে একটু দূরে মনে করিয়া সংসারের ঢেউএ একটু বিব্রত হইয়া পড়ি। যাঁহারা তুফানের ভিতরেও শান্ত থাকিতে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে অভ্যস্ত তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ত মৃত্যুকে জয় করিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এইরূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল। শান্ত ও অশান্ত অবস্থা একজনেরই অবস্থা হইলেও কিংবা অশান্ত অবস্থাটা শুধু বিবর্ত্তরূপে আরোপিত ধর্ম্ম হইলেও, সাধারণতঃ লোকে যে এই উভয়ের মধ্যে একটা ভেদ—যতই কাল্পনিক হউক না কেন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, এবং সেজন্য ব্যবহারিক অশান্ত-ভাব হইতে শান্তভাবে যাইবার চেষ্টা করেন; তাইতো সৃষ্টির অবস্থা জাগতিক ভাবটা কতকটা বন্ধনের মত মনে করিয়া সৃষ্টির অতীত দেশে যাইতে চেষ্টা করেন। জন্মটা জীবনগত লীলাটা তাঁহাদের নিকট কষ্টভোগের কারণ; তাই কোনও মতে তাঁহারা জন্মমৃত্যুর অতীত দেশে যাইবার জন্য ব্যস্ত হন। এই দলের সাধকগণ মৃত্যুকে আদৌ ভীতির চোখে দেখেন না, মৃত্যুকে আনন্দের

সহিত বরণ করেন। ইহাঁদের মধ্যে আবার যাঁহারা আপনাদিগকে কতকটা পাপী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যতই কাল্পনিক হউক না কেন মৃত্যুর পরে একটা নরকের ভয়ে মৃত্যুকে ততটা প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না; কিন্তু যাঁহারা একেবারে নিষ্পাপ, যাঁহারা ভগবৎ-প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছেন, যাঁহারা ভগবানকে দয়াময় কৃপাময় প্রেমময় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের মৃত্যু হইতে ভয়ের কোন কারণই থাকিতে পারে না। সাধকগণ অসৎকে অসৎ জানিয়া তাহাতে অনাসক্ত থাকিতে চেষ্টা করেন অনাসক্ত থাকিতে অভ্যস্ত হন, সুতরাং কোনও অসৎ বিষয়কে, এমন কি নিজ নিজ অসৎ দেহকে পর্য্যন্ত অসৎ বিনাশী আদ্যন্তবস্তু জানিয়া তাহার বিনাশের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। সাধকগণ দিনকে সৃষ্টির সঙ্গে এবং রাত্রিকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। দিনটা ভগবৎবিরহের সময়, রাত্রিটা মিলনের সময়। প্রতিদিন রাত্রির অন্ধকারে প্রেমের সাধনাটী এমনভাবে পূর্ণ করিয়া তোলেন, যাহাতে সেই মহারাত্রের মৃত্যুর আগমনে আনন্দের সহিত সেই পরম বন্ধু সহ পরম প্রেমাস্পদ সহ চরম মিলন-জনিত আনন্দের মহা সমাধিতে লয় হইবার সময়ও সকলের প্রাণে আনন্দ-রসের সঞ্চার করিয়া দিতে সক্ষম হন।

"আমি চল্লেম রে ভাই আনন্দকাননে,
সংসারের লোক যারে শ্মশান ব'লে ভয় করে মনে।
ভূতের বোঝা আজকে ভূতে মিশাইবার শুভদিন,
ঘটাকাশ আজকে আমার মহাকাশে হবে লীন।...
নিত্যানন্দধাম সেই কিছু নাই আনন্দ বই,
পিতা মোর সদানন্দ মাতা মোর আনন্দময়ী।
বৈতরণীর নয় তপ্ত জল, এ যে আনন্দ উথলে কেবল;
এ দীন-কাঙ্গালের তাই এত আনন্দ মরণে।"

গানটী স্মরণ কর। সাধক মৃত্যুকে আনন্দের দিন জানিয়া এমন আনন্দের সহিত বরণ করিলেন যে, সমস্ত ভীষণ রোগযন্ত্রণা প্রিয়বিরহ পর্য্যন্ত দ্রষ্টা ও শ্রোতার প্রাণ হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া সকলকে যেন আনন্দ-সাগরে ভাসাইয়া দিল। আমরা যেন মৃত্যুর সমস্ত কার্য্যকলাপকে—সংসারের অভিধানে যাহাকে রোগযন্ত্রণা বলে—আমাদের প্রিয়তমের দর্শনের সহায় জ্ঞানে আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে পারি। দেহাদির সমস্ত বন্ধনচ্ছেদনকে পরম মুক্তির চরম মিলনের সহায় জানিয়া আমরা যেন তাহাতেও পরম তৃপ্তি অনুভব করিতে পারি। সমস্ত উপার্জ্জিত কর্ম্মফলগুলিকে আমরা যেন ভোগের পরিবর্ত্তে ত্যাগে পরিণত করিয়া প্রেমময় পরম প্রেমাস্পদ ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া তাহাদিগকে পূর্ণভাবে সার্থক

করিয়া তুলিতে পারি। তাঁহাতে সমর্পণ করিতে কিছুই বাকী নাই এই অনুভব জনিত তৃপ্তি যেন আমাদের পরমানন্দ উপভোগের কারণ হয়। ভোগাদির কোনও বাসনা আসিয়া যেন আমাদের সেই পরম মিলনকে খণ্ডিত করিবার সুযোগ না পায়, পরম মিলনে বিঘ্ন জন্মাইতে না পারে। আমাদের দিনের সাধনা যেমন সব অবস্থার মধ্য দিয়া ভগবৎলীলা আস্বাদন করা, রাত্রের সাধনাও সেইরূপ বিশ্রামের মধ্য দিয়া প্রেমের মধ্য দিয়া পূর্ণ মিলনের মধ্য দিয়া স্বরূপতত্ত্ব অব্যক্ত নির্গুণ ভাব আস্বাদন করা।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে বেদ-উপনিষদে ভগবানের ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় ভাবেরই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় ভাবেরই সাধনপ্রণালী সেখানে বর্ণিত আছে। সেখানে উভয় ভাবেরই বেশ একটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। কালপ্রভাবে আস্তে আস্তে একটা নির্গুণভাব নিষ্ক্রিয়ভাব আসিয়া আমাদের সকলের মন যেন বেশী করিয়া দখল করিয়া বসিল। দেশের স্বচ্ছল অবস্থা যে এইরূপ অলসতার সহায় হইয়া লীলাভাবের উপর সক্রিয়ভাবের উপর বীতশ্রদ্ধ হইতে সাহায্য করে নাই তাহাও বলা যায় না। বুদ্ধ কামনা বাসনা আসক্তিকে শূন্যে পরিণত করিয়া জগতে একটা আদর্শ মৈত্রীভাব আনয়ন করিতে উপদেশ দিলেন; কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা সমস্ত

জগৎকেই শূন্যে পরিণত করিয়া লয়-যোগের সাহায্যে ভগবানের সগুণভাবকে লীলাভাবকে তুচ্ছ করিতে বসিল। ফলে হইল জন্ম সৃষ্টি দুঃখের কারণ—সংসার জেলখানা, কোনও মতে ইহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টাই প্রধান সাধনা। এই আদর্শের ফলেও মৃত্যুটাকে অনেকটা আদরের জিনিস করিয়া তোলা হইল। জন্মে আমরা ভগবান হইতে দূরে, তাঁহার আনন্দধাম হইতে সংসার-গারদে আসিয়া পড়ি। মৃত্যুর মধ্য দিয়া আমরা আবার সেই আনন্দধামে গিয়া পৌছি, আনন্দময়কে লাভ করি। প্রায় সকল দেশের সাধকগণই মৃত্যুকে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়বিশেষ মনে করিয়া অম্লানবদনে আলিঙ্গন করিয়া মৃত্যুঞ্জয় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধকগণের সাধনের স্থান শ্মশানে। শব-অবলম্বনে দেহকে শবে পরিণত করিয়া তাঁহারা শিবের সাধনা করেন। শব না হইলে যে শিবকে পাওয়া যায় না। তাই তাঁহারা চিরজীবী হইবার জন্য মরিবার পূর্ব্বেই মরিয়া যাইতে উপদেশ দিয়া থাকেন। মৃত্যুর প্রতি অতিশয় একটা আগ্রহকেও কিন্তু আমরা কতকটা বাড়াবাড়ি মনে করি, ইহা যে পরোক্ষভাবে লীলা-ভাবকে অস্বীকার করিয়া অগ্রাহ্য করিয়া অব্যক্ত ভাবকে প্রাধান্য দিতে চেষ্টা করে। মৃত্যুকে ভয় করার ন্যায় ইহাও যে অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আসল তত্ত্ব হওয়া উচিত জন্মমৃত্যু

উভয়কে সমানভাবে দেখা, উভয় ভাবে সমানভাবে উদাসীন থাকা, স্বরূপ ও লীলা ও নির্গুণ ও স্বগুণ এই উভয় ভাবকে তাঁরই দান মনে করিয়া উভয়কেই সমানভাবে আদরের সহিত বরণ করা। আসল কথা এই যে, মৃত্যুকে ভয় করা আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে দুঃখ করা, ইহার মূলে রহিয়াছে অজ্ঞানতা মূলে রহিয়াছে নাস্তিকতা মূলে রহিয়াছে একটা অত্যাসক্তি। যে ভগবানে বিশ্বাস করে যে পরকালে বিশ্বাস করে, যে ভগবানকে পরম মঙ্গলময় বলিয়া জানে, তাহার কিন্তু কাহারও মৃত্যুতে ব্যথিত হওয়া উচিত নয়। আমরা জানি না কিসে ভাল হইবে কিসে মন্দ হইবে, কিসে প্রকৃত কল্যাণ হইবে কিসে পরম আনন্দ লাভ হইবে। তিনি আমাদেরে ভালবাসেন, কিসে আমাদের পরম কল্যাণ হইবে তাহা জানেন; তিনি যখন কাহাকেও পাঠাইবেন তখন বুঝিব ভালর জন্যই পাঠাইয়াছেন, আর যখন লইয়া যাইবেন তখনও বুঝিব ভালর জন্যই লইয়া গেলেন। যতদিন কাছে থাকিবে ততদিন তাঁহার দেওয়া জিনিসের তাঁহারই প্রীতির জন্য যথাসম্ভব্ সেবা করিব। যাহার আসা-যাওয়ার উপর আমাদের কোনও হাত নাই, তাহার উপর একটা আসক্তি তৈয়ার করিয়া পরের জিনিসকে আপনার জিনিস মনে করিয়া বৃথা কষ্ট পাওয়া বিশ্বাসী ভক্তের কাজ নহে।



* * মা, তোমাদের সব খবর পেলাম……মার প্রাণে এ ঘটনায় যে কিরূপ আঘাত লাগে, তাহা মা ছাড়া অন্যে বুঝিতে পারে না……কতকটা যেন একটু বুঝিতে পারি, তাই মনে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে দেখি তোমাদের প্রাণের বোঝাটা একটু কমান যায় কিনা, তোমাদের প্রাণে একটু শান্তি আনা যায় কিনা।……ভগবানের ইচ্ছা না হইলে যে কিছুই হবার যো নাই, তাই মনে মনে ভগবানের নিকট বলিলাম তিনি যেন তোমাদের প্রাণে শান্তিদান করেন এবং পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করেন।

মৃত্যু বলিয়া আমি কিন্তু কিছু জানিনা, আমরা যে অমৃতের সন্তান 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। সরে বদলায় রূপান্তরিত হয় আমাদের দেহটা—আমাদের বাহিরের

পোষাকটা, আমরা ত আর দেহ নহি—আমরা যে অজর অমর নিত্য সর্ব্বগত সনাতন। ভগবান যেমন অমর আমরাও ঠিক তেমনই অমর। যাহারা এই স্থূলদেহকে সব মনে করে সার মনে করে যাহারা নাস্তিক, তাহারাই মনে করে ও করিতে পারে যে দেহত্যাগে সব শেষ হইয়া যায়। আমি এই দেহত্যাগকে একটা বস্ত্রপরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছু মনে করিতে পারি না, তাই ইহাতে কখনও বিচলিত হই না। তারপরে ভগবান বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এই দেহই অনেকের পক্ষে কষ্টের কারণ বন্ধনের অশান্তির কারণ। এখান হইতে সেখানে গিয়া এই নিরানন্দের দেশ হইতে তাঁহার সেই আনন্দধামে গিয়া আত্মা অনেকটা শান্তি অনেকখানি আনন্দ উপভোগ করিবার সুযোগ পায়। জীবের প্রকৃত বাসস্থান তাঁহার সেই আনন্দধামে, সেখানে গিয়া আনন্দময়কে লইয়া আনন্দে বিভোর থাকাই আমাদের প্রকৃত কাজ বা সাধনা। আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া তাঁহার সহিত আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধ ভুলিয়া দুই দিনের জন্য সংসারের থিয়েটার দেখিতে আসিয়া থিয়েটার করিতে আসিয়া যত কিছু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি। মায়ার দেশটা আসক্তির দেশটাই ত যত দুঃখ-কষ্টের কারণ। আমাদের আসল দেশটী যে সুখ-শান্তি আনন্দে ভরপুর; তাইতো জ্ঞানী

প্রেমিক সাধকগণ এদেশ হইতে সে দেশে যাইবার জন্য এত ব্যগ্র হন, এদেশে আসিয়া এদেশে থাকিয়াও সে দেশের চিন্তা লইয়া এতটা বিভোর থাকেন। মৃত্যুকে সাধারণ লোকে এতটা ভয় করিলেও তাঁহারা যে ইহাকে সে দেশের সরণি মনে করিয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিতে ভালবাসেন। সে দেশের দিকে তাঁর সেই আনন্দধামের দিকে আমরা একেবারে পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছি, তাইত আমরা মৃত্যুর নামে মৃত্যুর আগমনে এতটা অধীর হইয়া পড়ি। এদেশের খেলা, মায়ার জেল-ভোগ শেষ হইলেই আমরা সে দেশে যাবার অধিকার লাভ করি। অবশ্য যাঁহাদের চোখ খুলিয়া গিয়াছে যাঁহারা ভগবৎকৃপায় দিব্য দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আর এখান ও সেখানকার ভেদভাব উপলব্ধি করিতে পারেন না ; সর্ব্বত্রই তাঁহাদের ভগবৎধাম অপ্রাকৃত বৃন্দাবন, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের ব্রহ্মদর্শন। জীবন ও মৃত্যুর রহস্য তাঁহাদের চোখে আর পড়েনা, পড়িলেও থিয়েটারকে থিয়েটার জানিয়া তাঁহারা এসব অভিনয়কে আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়া থাকেন। তবে এ অবস্থাটা সাধারণ লোকের অনুভবে আসেনা। তাহারা যে মস্ত একটী সংস্কার জনিত পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া এদেশ ও সেদেশ উভয়ের মধ্যে একটা ভেদভাব তৈয়ার করিয়া বসিয়াছে। যাহা হউক আমাদের প্রকৃত বাসস্থান সেদেশে সেই আনন্দধামে, যে কারণেই হউক এদেশে

আসিয়াছি দু'দিনের জন্য অল্প দিনের জন্য। যে যত দিনের জন্য এখানে আসিয়াছে, তার সেই কটা গণাদিন ফুরাইয়া গেলেই তাহাকে সেদেশে চলিয়া যাইতে হইবে। ইহার উপর মানুষের, এমন কি দেবতাদেরও যে কোন হাত আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করিনা। 'বলরামের মায়া দেখা'র গল্পটী স্মরণ কর। যে যায় তাহার কল্যাণ হয় তাহার সব দুঃখ-ভোগ শেষ হইয়া যায়, সে পরমানন্দ-ভোগের অধিকার লাভ করে; আর যে এখানে পড়িয়া থাকে সে বুদ্ধির দোষে সংস্কারপ্রভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করে। এই দুঃখকষ্টের কারণগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কারণ হইতেছে আমাদের মোহ আমাদের আসক্তি। যে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে সে যে একান্তভাবে যায় নাই, সে যে অন্যত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, সে যে এখানকার চেয়ে বেশী শান্তিতে আছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইনা ভাবিতেও অভ্যস্ত নই, তাই বুঝিতে বিশ্বাস করিতেও অক্ষম। ইহার ঔষধও রহিয়াছে কিন্তু আমাদেরই হাতে।

যে এখন সূক্ষ্মভাবে আছে দেবতার কাছে গিয়াছে, তাহাকে দেখিতে হইলে আমাদেরও যে সূক্ষ্মদর্শন দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে হইবে। যাহাদের সে দর্শন খুলিয়া গিয়াছে তাহারা যে এদেশে থাকিয়াও পরলোকগত আত্মাদের দর্শন ও তাঁহাদের সহিত ভাব-বিনিময়ে সক্ষম। তাঁহাদেরে দেখিতে

হইলে তাঁহাদের পাইতে হইলে যতটা সংযম যতটা সাধন-ভজন আবশ্যক আমরা তাহা করিতে প্রস্তুত হই না, আমরা শুধু কান্নাকাটি করিয়া চীৎকার করিয়া আমাদের চঞ্চল চিত্তকে আরও চঞ্চল করিয়া তুলি। চেষ্টা না করিলে যে চেষ্টার ফল-লাভ অসম্ভব, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিনা। বুঝিনা আমাদের নিজের দোষে—কিন্তু আমাদের অহঙ্কার যে আমাদের অক্ষমতা স্বীকার করিতে কিছুতেই প্রস্তুত নহে। তাই আমরা যাহা জানিনা বুঝিনা তাহা আমরা মানিনা, তাহার অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করিনা। ইহার ফলে আমরা যে কতটা বঞ্চিত হই, তাহা ভাবিবার সুযোগও যে আর আমাদের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠেনা। বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আমরা যে এখন সব জানি বলিয়া বিশ্বাস করি। জগতে এমন কি থাকিতে পারে যাহা আমি জানিনা? আমি যে উত্তম পুরুষ! অথচ আসল কথা হইতেছে এই যে আমরা প্রায় কিছুই জানিনা। আমাদের জানার সংখ্যা ও পরিমাণ অপেক্ষা না জানার সংখ্যা ও পরিমাণ যে কোটীগুণ বেশী। যাহা জানিনা তাহা যে জানি না, সে বিষয় আমাদের জানিবার বুঝিবার ভাবিবার এখনও অনেক বাকী আছে। আমার মনে হয় ঋষিদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহাদের উপদেশ মতে সাধন করিয়া আমরা সূক্ষ্মদর্শন লাভ করিতে পারি। এই সূক্ষ্মদর্শন একবার

লাভ করিতে পারিলে আত্মীয়স্বজনদের পরলোকগমনে আমাদের এতটা বিচলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

আমরা এখন আস্তে আস্তে বড় স্বার্থপর হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের নিজেদের সুখ নিজেদের আরাম নিজেদের কল্পনাজল্পনা লইয়া আমরা এতটা ব্যস্ত হইয়া পড়ি যে, অন্যের সুখদুঃখের ভাবনা ভাবিবার আর আমাদের ততটা অবকাশ থাকে না। আমি তোমাকে না দেখিয়া কি করিয়া থাকিব, কি করিয়া বাঁচিব! সুতরাং তোমাকে বিদেশে যাইতে অপর সকল কর্ত্তব্যসাধনে তোমাকে বাধা দিতেও আমার কোনও কুণ্ঠাবোধ হয় না। পরমহংসদেব বলিতেন 'মুক্তি হবে কবে আমি যাবে যবে'; চৈতন্যদেব বলিতেন 'যাঁহা নাহি নিজ সুখ অনুরোধ' তাহাই প্রেম তাহাই সাধনা; এবং এই সাধনাই ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়।··· যে ভালবাসা প্রিয়জনের কল্যাণসাধনে সহায় হয় না, প্রিয়জনকে কর্ত্তব্যসাধনে উন্নতিবিধানে ভগবৎকার্য্যসাধনে বাধা দেয়, সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়—তাহা কাম তাহা মোহ। 'কাম অন্ধতমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর' একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আমার প্রিয়জন সংসারে দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণাঅশান্তি ভোগ করিতেছিল, এখন তাহার সে সব যন্ত্রণা দূর হইয় গিয়াছে, সে এখন পরমানন্দে আছে; একথা শুনিয়া এ কথায় বিশ্বাস করিয়া যে মা যে স্ত্রী প্রাণে প্রাণে

শান্তিলাভ করিতে না পারেন, তাঁহাদের ভালবাসাকে আমি ঠিক ভালবাসা বলিয়া মনে করিতে পারি না। যাহারা ভগবানে বিশ্বাস করে যাহারা পরলোক মানে তাহাদের কিন্তু আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে বিচলিত হইতে গেলে চলে না। একটু দূরে গেছে, একটু দেখতে পাচ্ছ না—তাহাও আবার নিজেরই অজ্ঞানতার জন্য নিজেরই সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে; তাই বলিয়া কি মনে করিতে হইবে সে আর নাই, তাহার সব ভালবাসা লোপ পাইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে ভুলিয়া যাইতে হইবে? এ যে ঘোর নাস্তিকতা! ইহা কখনই আস্তিক বিশ্বাসীর মুখে শোভা পায় না। সে সুখে থাকিলেও আমি দেখিতে পাই না বলিয়া এবং সে আমার সুখের সহায় হয় না মনে করিয়া দুঃখভোগ করা, কাঁদিয়া তাহার আত্মাকে কষ্ট দেওয়া তাহাকে কাঁদান, ইহা যে ঘোরতর হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। যে আমার কষ্ট সহ্য করিতে পারিত না আমার সুখে সুখী হইত, আজ আমি দুঃখ পাইয়া তাহাকে দুঃখ দিব, আমার দুঃখ দূর করিতে অসমর্থ হইয়া সে কি ভীষণ যাতনা ভোগ করিবে তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিব না, ইহা কি হৃদয়হীনতা নহে? সে এখন সে দেশের ভাল ভাল আত্মার সহিত মিলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বেড়াইয়া তাঁহাদের সঙ্গে আনন্দ করিবে, তাহার সেই আনন্দানুভূতির সহায় না হইয়া আমি দুঃখ

করিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়া তাহার আত্মাকে সে সব সুখ-বোধ হইতে বঞ্চিত করিব, দুঃখ-কষ্টে অধীর করিয়া তুলিয়া সেই আনন্দের দেশে নিরানন্দের ঢেউ তুলিতে চেষ্টা করিয়া সেখানকার সকলকে পর্য্যন্ত অস্থির করিয়া তুলিব, ইহা কি আমাতে শোভা পায়? যাহাতে তাহার আনন্দের সহায় হইতে পারি যাহাতে তাহার আত্মার আরও কল্যাণ হয়, সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত। সেজন্য প্রত্যহ ভগবৎসকাশে প্রার্থনা করিতে হইবে।

ভগবানকে বাদ দিয়াই তো আমরা যত অসুবিধায় পড়িয়াছি। প্রাচীন কালে ছেলেবেলা হইতেই মূর্ত্তির ভিতর দিয়া অমূর্ত্তকে ধ্যান করিতে ভালবাসিতে, শিবপূজার কৃষ্ণ-পূজার ভিতর দিয়া মূর্ত্তির ভিতর দিয়া আসল বস্তুকে দেখিতে, দেহের ভিতর দিয়া আত্মাকে ধরিতে ধ্যান করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। কুমারী বালিকা মনে করিত শিব বা কৃষ্ণ অর্থাৎ পরমাত্মাই যেন তাহার স্বামী। এইভাবে মূর্ত্তির ভিতর দিয়া স্বামীকে ভালবাসিতে শিখিত, মূর্ত্তিটা দেহটা যে বিশেষ কিছুই নয় আত্মাটাই যে প্রকৃত ভাল-বাসার বস্তু, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইত। তারপরে বিবাহের সময় বলিয়া দেওয়া হইত,—'এই যে তোমার স্বামী, ইহার ভিতরে শিব বা কৃষ্ণ বিরাজমান, ভক্তি দ্বারা সেবা দ্বারা সাধনা দ্বারা সেই অব্যক্তকে ব্যক্ত করিয়া প্রকট করিয়া

তুলিতে হইবে। স্বামী গায় হাত দিলে মনে করিবে, ইহার ভিতর দিয়া তোমার ভগবান তোমার গায় হাত দিতেছেন, তোমাকে আদর করিতেছেন; স্বামীর সেবার ভিতর দিয়া তোমার ভগবৎসেবা হইয়া যাইতেছে'। স্বামী হইয়া পড়িতেন ভগবৎবিগ্রহ, স্বামীর দেহ অপেক্ষা আত্মার দিকে স্ত্রীর প্রধান লক্ষ্য থাকিত; ইহার ফলে স্ত্রী বাস্তবিকই সহ-ধর্ম্মিণী হইয়া পড়িতেন। বিবাহটা ছিল আত্মায় আত্মায়। এইভাবে মায়ের ভিতর দিয়া অন্নপূর্ণার, বাপের ভিতর দিয়া বিশ্বনাথের, ছেলের ভিতর দিয়া বালগোপালের, মেয়ের ভিতর দিয়া কুমারী ভগবতীর, জীবের ভিতর দিয়া শিবের দর্শন ধ্যান ও সেবার অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। ফলে সংসার কর্ম্ম স্বজনসেবা পূজায় পরিণত হইত, মানুষের মন স্থূলে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া ভিতরের দিকে আত্মার দিকে ছুটিয়া যাইবার অবকাশ পাইত। পরকীয়ভাবে অর্থাৎ পরমাত্মা বুদ্ধিতে সাধনের আরোপ সাধনপ্রণালীর ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। শরীরটা মূর্ত্তি, আত্মা আসল জিনিস। আমার প্রিয়জন সামান্য একটা স্থূলদেহে সীমাবদ্ধ নহে, স্থূলদেহটা তাহার পোষাক মাত্র; এই বিশ্বাস পাকা হইলে মৃত্যু আমাদের নিকট হইতে সবটা হরণ করিতে পারে না—মৃত্যুর পরেও অনেকখানি সে রাখিয়া যায়। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন তখন সূক্ষ্ম

ও কারণ অবস্থার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া শ্রাদ্ধাদির দ্বারা তাহার তৃপ্তিসাধনে সচেষ্ট থাকিত। এখন আমরা অনেকটা শিক্ষাদীক্ষার দোষে নাস্তিক স্থূলদর্শী অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছি, তাই প্রিয়জনের দেহত্যাগকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ মনে করিয়া, কিছুই বাকী থাকিল না সবই শূন্যে লয় হইয়া গেল ভাবিয়া তাহার একান্ত ও অত্যন্ত বিয়োগজনিত দুঃখে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ি। এসব দুঃখের কারণ অনেকাংশে নাস্তিকতা। বিশ্বাসীর পক্ষে নাস্তিকদের মত অতটা বিচলিত হওয়া যে শোভা পায় না।

মৃত্যু আমাদিগকে যে একটি মহতী শিক্ষাদান করে তাহা না বুঝিলে চলিবে কেন? ভালবাসা প্রকৃতপক্ষে আত্মার ধর্ম্ম, আত্মা যে প্রেমস্বরূপ রসস্বরূপ। আমরা সেই আনন্দ-ময়ের সন্তান 'অমৃতস্য পুত্রাঃ', আমাদের প্রকৃত বাসস্থান তাঁহার সেই আনন্দধামে। আমরা এখানে আসিয়াছি দু'দিনের জন্য—তাঁহার থিয়েটার দেখিতে থিয়েটার করিতে। আমরা এখন যদি একান্তভাবে এদেশে সীমাবদ্ধ হইয়া সে দেশের কথা একেবারে ভুলিয়া আত্মার সেই ব্রহ্মানন্দলাভে বঞ্চিত হই, তবে তাহা চলিবে কেন? পরম মঙ্গলময় আমাদের এই ভুল ভাঙ্গিয়া না দিয়া কি থাকিতে পারেন? আমরা সত্যকে ভুলিয়া মিথ্যা লইয়া বিভোর থাকিব, ইহা সত্যস্বরূপ আর কি করিয়া সহ্য করিতে পারেন? 'মিথ্যা

জগৎ ভেঙ্গে দেখাও মা সত্ত্বাশূন্য করে জীবে' কথাটা বুঝিতে চেষ্টা কর। আমার পরম প্রেমাস্পদের উপস্থিতিতে সান্নিধ্যে প্রকাশে যে দেহ আমার এত আদরের বিষয় ছিল, আত্মার অভাবে আত্মার বিকাশের অভাবে সে দেহ আর কাহারও প্রিয় নয়, সে দেহ আর ঘরে রাখিতে গেলে চলিবে না। দেহ যে কাহারও প্রিয় নয়, দেহী আত্মাই যে আমাদের প্রকৃত ভালবাসার বস্তু, মৃত্যুই তো তাহা আমাদের এমন সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়া থাকে। রাধারাণী কেন যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ অপেক্ষা তাঁহার বিরহকে এত বেশী মঙ্গলজনক মনে করিতেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। 'সঙ্গমে একরূপতা' সঙ্গমকালে মিলনের সময় আমরা প্রিয়জনের স্থূলদেহে সীমাবদ্ধ হইয়া তাহার আত্মার সর্ব্বগত ভাব সর্ব্বব্যাপিত্ব ভুলিয়া গিয়া তাহাকে একটা সামান্য স্থূলদেহে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলি। 'বিরহে তন্ময়ং জগৎ' বিরহের সময় বিরহ-ভাবের মধ্য দিয়া বিরহ-আগুনে চিত্তের সব ময়লা দূর হইয়া যাওয়ায় চিত্ত শুদ্ধ ও শান্ত হওয়ার ফলে আমরা তাহার স্থূলদেহ ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহের মধ্য দিয়া তাহার আত্মা পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিবার সুযোগ পাই। আত্মা নিত্য সর্ব্বগত, তাই তখন সর্ব্বগতকে সর্ব্বত্র পাইবার সুযোগ হওয়ায় আমরা বিরহে তন্ময় হইয়া জগৎতত্ত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হই। প্রকৃত

সাধক প্রকৃত ভক্ত বিরহকে দুঃখকষ্টকে এজন্য এত ভাল-বাসেন। চৈতন্যদেবের বিরহ-ভাবে সাধন সাধনজগতে দুর্লভ তত্ত্ব পরম রহস্য। যে বিরহভাব নাস্তিককে শূন্যে লয় করিয়া হতাশ করিয়া তোলে, সেই বিরহই যে আস্তিককে আস্তিকের চিত্তকে নির্ম্মল করিয়া পবিত্র করিয়া প্রেমাস্পদের সঙ্গে পরম মিলন সাধন করিবার সহায় হইয়া প্রেমিকের জীবন সার্থক করিয়া তোলে। সংসারের কষ্ট বুঝিনা, সাংসারিকদের দুঃখ-কষ্টে যে আমার সহানুভূতি নাই, সে কষ্ট দূর করিতে যে আমি চেষ্টা করি না তাহা নহে; তবে কষ্টের স্বরূপ দর্শন করিয়া তাহার লক্ষ্য বুঝিয়া, তাহাকে সুখের নিদান মনে করিয়া আমি তাহাতে বিচলিত হই না। বাস্তবিকই আমি মৃত্যু মানি না। আনন্দময় হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়, একথা মনে রাখিয়া জগতে দুঃখকষ্টের পাপতাপের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাকে আমি যে কতকটা নাস্তিকতা ছাড়া আর কিছু মনে করিতে পারি না। ভগবান তোমাদের একটু চোখ খুলিয়া দিন, একটু স্বরূপদর্শনের সহায় হউন, তোমাদের তাপিত প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করুন এই প্রার্থনা করি। ছেলের অভাব যে কি অভাব, তাহা যে বুঝিতে পারি না তাহা নহে; তবে অভাব জিনিসটাকেই যে আমি অভাব বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত নই, অভাবের ভিতরেও যে ভাবটা থাকিয়া যায়। সে আমার প্রিয় ছিল

প্রিয় আছে চিরকাল প্রিয় থাকিবে। আমার প্রেমের অভাব-সাধন করিবে এমন ক্ষমতা জগতে কাহারও নাই—মৃত্যুরও নাই।……তার স্ত্রীপুত্রকন্যাদেরে যে দেখিবার সে দেখিবে, তাহার আত্মা ইহাদের কল্যাণসাধনে সচেষ্ট থাকিবে। দেববিশ্বাসী দেবতার কাছে চলিয়া গিয়াছে, সেখানেও সে দেবতার সেবায় নিযুক্ত আছে, মানস-নয়নে ইহা প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা কর। যাবার সময় হলে সে চলে যায়, তাহার মধ্যে অন্য কারণ খুঁজিতে গিয়া মন খারাপ করা উচিত নয়। রোগ আদি একটা নিমিত্ত কারণ মাত্র।……সকল মৃত্যুই যে রহস্যজড়িত।…যে মৃত্যুর রহস্য জানে, তত্ত্ব বোঝে তাহার কাছে আর কিছুই যে রহস্যময় থাকে না। সব দৃষ্ট হয়ে গেলে আর কিছু অদৃষ্ট থাকে কি? অদৃষ্ট থাকে শুধু অজ্ঞানীর কাছে, যার দৃষ্টিশক্তি কম তার কাছে। শাস্ত্রও বলেন জ্ঞানীর অদৃষ্ট নাই, সে যে সব দেখে রেখেছে। একটু শান্ত হও। তোমরা যে ভগবান মান তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়া বিশ্বাস কর, তোমাদের এতটা বিচলিত হইতে গেলে চলিবে কেন? শ্রীভগবান সকলের প্রাণে শান্তিদান করুন এই প্রার্থনা।..,...সৃষ্টি রাখিতে গেলে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে গেলে মৃত্যুটা যে অবশ্যম্ভাবী। বাল্য যৌবন প্রৌঢ়ত্ব বার্দ্ধক্য আদি ভেদের ভিতর দিয়া মানুষের কল্যাণ সাধন করা যখন আবশ্যক, তখন তার পরের অবস্থাটা বাদ দিলে চলিবে

কেন? জগৎ হইতে মৃত্যুটা উঠাইয়া দিলে জীবের যে কি ভীষণ পরিণতি হইত তাহাও চিন্তনীয়। মৃত্যু উঠাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিটাও বোধ হয় লোপ করিতে হইত। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই যে ক্রমোন্নতির পথটা সহজ করিয়া তোলা হইয়াছে।

তবে বলিতে পার মৃত্যুতে তো আপত্তি নাই, অকাল-মৃত্যুটা ত দূর করা উচিত। আমার একান্ত বিশ্বাস আমরা ভগবৎবিধানমতে চলিলে, আমাদের জীবনযাত্রায় অস্বাভাবিক কৃত্রিমতা আসিয়া না জুটিলে, অসংযতভাব অধর্ম্মভাব আসিয়া আমাদের সমাজকে আমাদের দেশকে এইভাবে অভি-ভূত করিয়া না ফেলিলে, এতটা অকাল-মৃত্যু আমাদের দেখিতে হইত না। হিন্দুগণ কর্ম্মফলকে খুব মানেন, তাই অকাল-মৃত্যুকে আমাদের—আমাদের আত্মীয়স্বজনদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের উপরে রাখিয়া দিয়াছেন, সে কর্ম্ম এজন্মেরই হউক আর পূর্ব্বজন্মেরই হউক। মা-বাপের কর্ম্মফল যে সন্তানের ভোগ করিতে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। মা-বাপের অসংযমের ফলে ছেলেমেয়েকে অনেক কুৎসিত ব্যারামে কষ্টভোগ করিতে হয়। সেখানেও প্রাচীন হিন্দুগণ ছেলেমেয়েদের কর্ম্মফলকে অগ্রাহ্য করেন নাই। ছেলেমেয়েরা আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিবার উপযুক্ত মা-বাপের কাছে জন্মগ্রহণ করে, ফলে সন্তানদের

কর্ম্মফল-ভোগও অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। মা-বাপের কর্ম্মফল জনিত প্রায়শ্চিত্ত নিজেদের ও ছেলেমেয়েদের ব্যাধি বা অকাল-মৃত্যুর ভিতর দিয়া ঠিক তালে তালে অনুষ্ঠিত হইয়া যায়। মরণের কাল যদি অবধারিত থাকে তবে দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করিয়া দেশের লোকদের ধর্ম্মবৃত্তি অনুশীলিত করিয়া দেশের অকাল-মৃত্যু দূর করা যায় কিনা তাহাও অনেকে জানিতে চান। আমার বিশ্বাস আত্মা জন্মগ্রহণ করিবার আগে নিজের পূর্ব্বকর্ম্মের প্রাক্তনের অনুকূল জমি অনুসন্ধান করে, যাহাদের অকাল-মৃত্যু একান্ত আবশ্যক তাহারাই অস্বাস্থ্যকর দেশে অসংযত বাপ-মার ঘরে জন্মগ্রহণ করে। দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করিয়া তেজস্বী দীর্ঘজীবী আত্মাকে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করা যাইতে পারে। দেশের ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত করিয়া ধার্ম্মিক আত্মাকে দেশে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আনয়ন করা যাইতে পারে। পিশাচের অনুকূল জমিতে পিশাচ থাকিবে, দেবতার অনুকূল জমিতে দেবতা থাকিবেন ইহাই ত স্বাভাবিক। দেশের সমাজের উন্নতিবিধান করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিলে দেশ হইতে অকাল-মৃত্যু উঠাইয়া দেওয়া যায়, ইহা আমাদের বিশ্বাস। প্রাচীনকালে এই ভারতে অকাল-মৃত্যু প্রায় দেখা যাইত না, পাশ্চাত্য সভ্যেরা যদি স্বাস্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের দিকে

একটু দৃষ্টি রাখিয়া সংযম অভ্যাস করিতেন তবে সেখানেও অকাল-মৃত্যু প্রায় দেখিতে পাওয়া যাইত না। ভারতবাসী আজকাল যে ভাবে জীবন যাপন করে তাহাতে আমরা যে এখনও দীর্ঘজীবী লোক দেখিতে পাই, ইহা বোধ হয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের পুণ্যফল। আমাদের কর্ম্মফলের দিকে চাহিলে তো এ জাতির ধ্বংসই অনিবার্য্য মনে হয়।

সকল আত্মাই যে মৃত্যুর পর সুখে থাকে তাহা আমি বলি না। ঘোরতর পাপীদের আত্মা যে মৃত্যুর পরে সূক্ষ্মভাবে বা পুনর্জ্জন্মগ্রহণের পরেও অধিকতর কষ্ট পাইয়া থাকে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা জীবনে বিশেষ কোনও অন্যায় কাজ করে না যথাসম্ভব ভালভাবে জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করে, তাহারা মৃত্যুর পরে এখানকার সুখশান্তি হইতেও অনেক বেশী শান্তি উপভোগ করিয়া থাকে। এই যে ভীষণভাবের নরকবর্ণনার কথা শুনিতে পাই, ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের অবস্থায় লোককে কুপথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে। হিন্দু পুরাণকারেরা অনেকে ঐসব নরকের বিবরণ অনেকটা বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে নকল করিয়া লইয়াছেন। হিন্দুরা স্বর্গনরকে বিশ্বাস করিলেও প্রাচীন গ্রন্থে ভীষণ বা বীভৎসভাবে উহার বর্ণনা বেশী দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। অপমৃত্যুর ফলে নরকভোগের কথা এইভাবে লেখা না থাকিলে

অনেকে হয়তো দুঃখকষ্ট রোগযন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইত। ভাল কাজে প্রবৃত্ত ও মন্দ কাজ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য কর্ম্মফলের মাত্রাটা বাড়াইয়া স্বর্গনরকের মাত্রাও অনেকটা বাড়ান হইয়া গিয়াছে।

* * স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। ভালই হউক আর মন্দই হউক, ভারতের নারী স্বামীকে সকলের সার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব মনে করে; সুতরাং তাঁহার অভাবে আর যে কিছু বাকী থাকে তাহা মনে করিতে পারে না। জীবনটা একটা দুর্ব্বিসহ বোঝায় পরিণত হয়। মৃত্যু আসিয়া ইহাদের মন হইতে এই বোঝা নামাইয়া ইহাদের অব্যাহতি দিয়া থাকে। ভারতের বিধবাদের মত আশাহীন সুখহীন ভারগ্রস্ত জীবন জগতে আর কোথাও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। যাহার উপরে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা যায় তাহার অভাবে মানুষের এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে।...তোমাদের যাহা গিয়াছে তাহা যদি মিটাইতে পারিতাম, তোমাদের মানসিক কষ্ট যদি কোনও মতে দূর

করিতে পারিতাম, তবে সান্ত্বনা দেওয়ার মুখ থাকিত। এখানে স্থূলে আবেদন করিবার বিশেষ কিছুই দেখিতে পাই না, তাই তোমাদের বিচার-বুদ্ধির কাছে আবেদনই প্রধান সম্বল মনে হয়। আমার কথাগুলি একটু ভাবিয়া দেখিলে সুখী হইব।

তোমরা জান আমি মৃত্যু মানি না—মৃত্যু হয় দেহের, আমার দেহ নাই। মৃত্যুতে আমাদের অতি সামান্য বাহিরের অংশটা স্থূল দেহটা বদলায় মাত্র, ভিতরের সূক্ষ্ম ও কারণ-দেহ তাহার আধার আত্মা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। বুঝিতে চেষ্টা কর স্বামী একেবারে যান নাই, সূক্ষ্মভাবে আছেন তোমার কাজকর্ম্ম দেখিতেছেন মনের ভাব জানিতে পারিতেছেন; তারপরে তাঁর স্মৃতি রহিয়াছে, তাঁর ছেলেমেয়ে মা-বাপ ভাইবোন সংসার—সবই তো রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যেও কি তিনি বর্ত্তমান নাই?. ইহাদের ভিতর দিয়া কি তাঁহাকে কতকটা পাওয়া যায় না? ইহারা কি তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় না? ইহাদের সেবায় কি তাঁর সেবা হয় না, তাঁর আত্মার তৃপ্তিসাধন হয় না? তিনি রহিয়াছেন তাঁর সব রহিয়াছে, অথচ তুমি মনে কর তোমার কিছুই নাই—সব গিয়াছে; বলতো একি কথা। তারপরে একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখতো তুমি কে? আধ্যাত্মিকভাবে তুমি যে ভগবতীর অংশ—তুমি সুখদুঃখের অতীত; তুমি জগতের মাতা, জগতের মঙ্গল সাধন করিতে

আসিয়াছ, জগতে ভগবৎভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে নিযুক্ত আছ। তোমার স্বামীর মৃত্যু হয় নাই, তুমি এখনও মন-মানসে তাঁহার পূজা করিতে সেবা করিতে সক্ষম। তোমার আত্মাকে তাঁহার আত্মার সহিত মিলাইতে, তোমার আত্মায় তাঁহার আত্মাকে অনুভব করিতে কে বাধা দিতে পারে? আমাদের আত্মা যে অজর অমর নিত্য সর্ব্বগত সনাতন।

তারপরে সামাজিকভাবে ব্যবহারিকভাবে তুমি কে? এখানে তুমি মা-বাপের মেয়ে, ভাই-বোনদের ভগ্নী, স্বামীর স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ীর বৌ-মা, দেবরদের বৌ-দি, ছেলেমেয়েদের মা, বন্ধুদের সখী, দাসদাসী গরীবদুঃখী প্রতিবেশীদের মা, সমাজের মঙ্গলদায়িনী কল্যাণকর্ত্রী, বঙ্গমাতার ভারতমাতার জগৎমাতার অংশ—ইহাদের কার্য্যসাধনে তুমি নিযুক্তা। এখন ভাবিয়া দেখতো তোমার স্বামীর দেহান্তে তোমার কোন্ কোন্ সম্বন্ধ দূর হয়ে গেছে, কোন্ কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেছে, কোন্ কোন্ জিনিসের অভাব হয়েছে? তুমি জান স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বামীর সহধর্ম্মিণী; সুতরাং তোমার স্বামী এখন স্থূলদেহ দ্বারা যে যে কার্য্য করিতে অক্ষম, তাঁহার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ সাহায্য হইতে বঞ্চিত, সে সম্বন্ধে তাঁহার সেই সেই কাজগুলি যথাসম্ভব যথাশক্তি পূর্ণ করিতে তোমার কি চেষ্টা করা উচিত নয়? তোমার কর্ত্তব্য যে এখন আরও

বাড়িয়া গিয়াছে। এখন তুমি ছেলেমেয়েদের শুধু মা নও—একাধারে মা-বাপ, শ্বশুরশাশুড়ীর বৌ-মা ও ছেলে দুইই। তোমার শরীরকে তিনি কত ভালবাসিতেন কত আদর করিতেন, তোমার সুখ-শান্তির জন্য কত ব্যস্ত হইতেন ; বলতো তুমি এখন তোমার এই শরীরকে অগ্রাহ্য করিলে তোমার মনে কষ্ট রাখিলে তাঁহার আত্মাকে কতটা কষ্ট দেওয়া হইবে? তাঁহার ছেলেমেয়েদের আত্মীয়স্বজনদের এখন তোমার এমনভাবে সেবা করিতে হইবে, যাহা দেখিয়া তাঁহার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে। এখন বলতো, তোমার কেহ নাই তোমার এখন কিছু করিবার বা ভাবিবার আর বাকী নাই, এ সব ভাব কি তোমাতে শোভা পায়? যাঁহারা রহিয়াছেন যাঁহারা তোমার ছেলেমেয়েদের সেবার জন্য সুখের জন্য এত করিতেছেন, তাঁহাদের সামনে নিজেকে ছেলেমেয়েদেরে অনাথা বলিয়া প্রকাশ করিতে যাওয়া তোমার পক্ষে কিরূপ হৃদয়হীনতার কিরূপ অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিও।

জানি তোমার মনের অবস্থা, বুঝিতে পারি তোমার বুকটা কতখানি ভেঙ্গে গেছে ; কিন্তু তাই বলিয়া তুমি কি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া তাহার আত্মাকে কষ্ট দিতে সাহস করিবে? তার সুখের জন্য যে তুমি সব করিতে প্রস্তুত থাকিতে, একথা আজ ভুলিয়া গেলে চলিবে কেন? স্বামী কাছে নাই—মনে

কর তিনি এখন প্রবাসে সূক্ষ্মদেশে গিয়াছেন, তাই তুমি এখন ব্রহ্মচারিণী—প্রোষিতভর্ত্তৃকা ; ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি পালন করিয়া সমস্ত কর্ত্তব্যগুলি সাধন করিয়া তোমার ভিতর দিয়া ভগবান যে কাজ যে ভাবে পূর্ণ করাইয়া লইতে চান তাহা সুসম্পন্ন করিয়া, তুমি তোমার স্বামীর তৃপ্তিসাধনে আত্মীয়দের কল্যাণসাধনে ভগবৎপ্রীতিসম্পাদনে সচেষ্টা। পার্ব্বতী যেমন তপস্যা করিয়া শিবকে লাভ করিয়াছিলেন, তোমারও যে এখন তেমনই তপস্যা করিয়া স্বামীকে দর্শন করিতে হইবে, স্বামীর ভিতর দিয়া জগৎস্বামীকে লাভ করিতে হইবে। মনে রাখিও তোমার এই তপস্যারূপ সাধনে যেন তোমার আত্মীয়স্বজনদের সেবারূপ প্রধান তপস্যায় বিঘ্ন না জন্মায়।...তোমার কথা ভাব ও কাজ দেখিয়া কেহ যেন মনে করিতে না পারে যে তোমার সব গিয়াছে, তোমার আর কেহ নাই, তোমার আর কোনও কর্ত্তব্য নাই। মনে রাখিও তোমার ছেলেমেয়েদের নিকট তুমি এখনও মা, মা-বাপের নিকট এখনও সেই আদরের মেয়েই রয়েছ ; তোমার তীব্র বৈরাগ্য যেন তাহাদের প্রাণে আঘাত না করে। তোমার সব কর্ত্তব্য রহিয়াছে, একটা কর্ত্তব্য একটু রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র। তুমি এখন অনেক অংশে ব্রহ্মচারিণী হইয়াছ ; তোমার আহার-বিহার এখন অনেকটা ব্রহ্মচারিণী-দের মত সংযত হওয়া দরকার, কোনও বিলাসিতায়

আমোদপ্রমোদে এখন আর তোমার পূর্ব্বের ন্যায় যোগ দেওয়া উচিত নয়, যে সব কাজ ভাব খাদ্য উত্তেজক—চিত্তকে চঞ্চল করে, তাহা হইতে তোমাকে এখন দূরে থাকিতে হইবে। স্বামীর আত্মা তোমার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। যাহাতে তাঁহার আত্মার কল্যাণ হয়, যাহাতে তিনি শান্তি পান, তোমাকে এখন এমনভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে। অবস্থা খারাপ জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য কি ব্যবস্থা করিবে, এ সম্বন্ধে আমি আর কি বলিতে পারি? যে সব আত্মীয়স্বজন তোমার হিতৈষী যাঁহারা তোমার সব অবস্থা জানেন, তাঁহাদের উপদেশ মত চলাই বিধেয় মনে হয়। তোমার পক্ষে স্বাধীনভাবে চলাটা তত সঙ্গত মনে হয় না। আমি তো মনে করি কোনও শিল্পাদি কার্য্য দ্বারা, অন্ততঃ নিজে ও ছেলেমেয়ে সকলে মিলিয়া চরকায় সূতা কাটিয়া জীবন যাপন করা ছেলে মানুষ করা খুব অসম্ভব কথা নয়; কিংবা প্রতিবেশী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেও মন্দ হয় না। মনে রাখিও আমি এ বিষয়ে উপদেশ দিতে অক্ষম।......

কে বলে স্বামীকে ভুলে যেতে স্বামীকে শত্রু মনে করিতে? যে ওসব কথা বলে আমি তাহাকে নাস্তিক মনে করি। ভালবাসার বিনাশ হয় যাঁহারা বলেন তাঁহারা পাপ করেন। আমিতো বলি স্বামীর স্মৃতি যাহাতে

সর্ব্বদা মনে জাগরূক থাকে তাহার চেষ্টা কর; তাহার ভালবাসার স্মৃতি তোমার চিত্তে বল দান করিবে, তোমাকে সব প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা করিবে, তোমার সাধন-ভজনের সহায় হইবে। স্বামীর কথা ভুলিতে পারি না, ভগবানের ধ্যান করিতে গেলে স্বামীর মূর্ত্তি এসে মনের কাছে উপস্থিত হয়,—আমি তো এটা শুভ লক্ষণ মনে করি। তোমাদের বাড়ীতে তো মূর্ত্তির ভিতর দিয়া ভগবানের পূজা করা হয়। তুমি এখন হইতে স্বামীর ভিতর দিয়া স্বামীর ফটো অবলম্বনে ভগবানকে ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা কর। পাথরের মূর্ত্তির মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বোধন দ্বারা ভগবানকে প্রকট করা যত সহজ, স্বামীর মূর্ত্তির ভিতর দিয়া ভগবানকে ফুটাইয়া বাহির করা আমার মতে তদপেক্ষা বেশী সহজ। ছেলেবেলা তোমরা যেভাবে শিবমূর্ত্তির কৃষ্ণ-মূর্ত্তির ভিতর দিয়া স্বামীর জগৎস্বামীর ধ্যান করিতে সেবা করিতে, এপূজার বিধানও কতকটা সেইরূপ মনে করিও। স্বামীকে ভালবাসিতে কে নিষেধ করে? যে নিষেধ করে সে যে অবিশ্বাসী সে যে নাস্তিক। এখন তোমাদের ভালবাসা সব ময়লা সংস্কার দূর হইয়া অতি সহজে পবিত্র হইয়া ভগবৎপ্রেমে পরিণত হইতে পারিবে।

······তোমার স্বামী যে আবার জন্মগ্রহণ করেন নাই তাহা কি করিয়া বুঝিবে, এটা ঠিক কথা। সূক্ষ্ম আত্মার

অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলেও আমি পুনর্জন্মে অবিশ্বাস করি না, করিবার কারণও খুঁজিয়া পাই না। কোন কোন আত্মা দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেহ ধারণ করেন, আর কোন কোন আত্মা সূক্ষ্মভাবে অনেক দিন থাকিয়া তারপরে জন্মগ্রহণ করেন। 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' কথাটা স্মরণ কর। যাঁহারা একটা তীব্র সংস্কার তীব্র কামনা লইয়া দেহত্যাগ করেন, তাঁহারাই বোধ হয় শীঘ্র শীঘ্র জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা ধার্ম্মিক কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রেমিক তাঁহাদের আত্মা অনেক দিন পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে আসিয়া আত্মীয়-স্বজনদেরে তাহাদের কার্য্যকলাপকে দেখিয়া যান, তাহাদেরে সাহায্য করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেন, তাহাদের জন্য অপেক্ষা করেন; পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইলে যাহাতে পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধানুসারে সব বিশেষ বিশেষ আত্মীয়স্বজন-দেরে কাছে পেতে পারেন তাহার চেষ্টা করেন। স্বামীর আত্মা স্ত্রীর জন্য, স্ত্রীর আত্মা স্বামীর জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করিয়াছেন, মৃত্যুর সময় আসিয়া আদর করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া অনেক কথা শুনা যায়। অন্ততঃ আমি কিন্তু এসব কথায় খুব বিশ্বাস করি। এমন অনেক প্রমাণ পাইয়াছি যাহা অন্যকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ না করিলেও আমি নিজে কখনও অবিশ্বাস করিতে পারি না। প্রত্যহ পূজার সময় তাঁহার আত্মার কল্যাণের

জন্য ভগবৎসকাশে প্রার্থনা করিও। শ্রাদ্ধ ঠিক ভাবে করা হইলে তাহার উপকারিতায় আমি বিশ্বাস করি। তবে শ্রাদ্ধে দত্ত পিণ্ড ও কাপড় আদি যে সূক্ষ্ম আত্মার ভোগে আসে তাহা আমি জানি না। সূক্ষ্ম আত্মার পক্ষে গ্রহণীয় বস্তু বা ভাব যাহা কিছু প্রদত্ত হয় তাহাতে তাহার আনন্দ হয়। আত্মীয়স্বজন যে তাহার কথা এখনও ভুলিয়া যায় নাই তাহার কল্যাণ কামনা করেন, অন্ততঃ ইহাও তাহাদের আনন্দের কারণ হয়। শুভ ইচ্ছা ও শুভ বাসনার ফলে আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না।

সূক্ষ্ম আত্মার অস্তিত্ব আমি খুব মানি—পুনর্জন্মও মানি। সূক্ষ্ম আত্মা স্বপ্নের ভিতর দিয়া ধ্যানের সময়কার মনের সূক্ষ্মাবস্থার মধ্য দিয়া অপরোক্ষ ভাবে যে মানুষকে সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা আমি বিশ্বাস করিয়া থাকি। স্বর্গগত মাতা সন্তানের সুবিধার সুখের জন্য যে লোকের মধ্য দিয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করেন, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চিত্ত স্থির হইলে অনেক সূক্ষ্ম আত্মা দর্শন করা যায়। রোগীর কাছে বসিয়া মৃত্যুশয্যায় ভালমন্দ আত্মা আপন প্রাধান্য স্থাপন করার জন্য যে লড়াই করে, সাধু লোকের আগমনে ভগবৎকথার প্রারম্ভে যে খারাপ আত্মা পলায়ন করে—তদ্দর্শনে রোগী যে অঘোরে 'পালাও কেন, এসনা দেখি কি করিতে পারে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে

তাহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। ভাল ভাল আত্মা সর্ব্বদা আমাদের সাহায্য করিতে ব্যগ্র, সৎচিন্তা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহাদেরে সাহায্য করিবার সুযোগ দেয়। খারাপ চিন্তা খারাপ কাজ খারাপ আত্মাকে ডাকিয়া আনে। এজন্য মৃত্যুর সময় আমাদের চারিদিকের হাওয়াটাকে ভগবৎভাবে ভাবিত করিয়া রাখা উচিত—তাহা হইলে স্থূলভাবে অন্ততঃ সূক্ষ্মভাবেও আমরা ভাল ভাল আত্মার সঙ্গলাভে সাহায্য-লাভে সক্ষম হইব। এইজন্যই বোধ হয় সাধুগণ মৃত্যু-কালে মৃতকল্প লোকের নিকট বসিয়া কান্নাকাটি না করিয়া সেখানে বসিয়া ভগবানের নাম করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। সংকীর্ত্তন করিয়া মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়ার প্রথা অনেক সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়।

* হে ভগবান, হে প্রাণারাম, যে একবার তোমার কৃপায় তোমার বিধান মতে চলিয়া তোমার খাসমহলে গিয়া পৌঁছিয়া তোমার জ্যোতির্ম্ময় প্রেমময় আনন্দময় রূপটী দেখিয়া লইয়াছে সে যে তোমার বিচিত্র রূপের মধ্য দিয়া বিচিত্র ভাবের মধ্য দিয়া বিচিত্র কাজের মধ্য দিয়া তোমাকে চিনিয়া লইয়া তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তোমারই হইয়া যায়। তুমি ক্রুশকাষ্ঠের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়া ভক্ত যীশুর জীবনকে মৃত্যুর ভিতর দিয়া মহিমাময় করিয়া তুলিলে; ভক্ত প্রহ্লাদের নিকট প্রস্তরস্তম্ভের মধ্যে লুকাইতে গিয়া ধরা পড়িলে, ভীষণ নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়াও বাৎসল্যরসে অভিভূত হইয়া প্রহ্লাদের হৃদয়কে গলাইয়া দিলে। সমস্ত অসুখের মধ্যে বিপদের মধ্যে মৃত্যুর মধ্যেও যে তোমার ভক্তগণ তোমার সুখময় অভয়প্রদ অমৃতপূর্ণ মুখখানি দেখিতে পান। আমরা তোমায় ভুলিয়া দুঃখ-কষ্টকে মৃত্যুকে ভয় করিয়া কি যাতনা কি অশান্তি পদে পদে অনুভব করিতেছি! হে আবি, তুমি আমাদের নিকট প্রকাশিত হও—তোমার আলোকে আমরা দেখি আমরা অমৃতের সন্তান। ভয় দূরে পলায়ন করুক। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার আনন্দধামে ডাকিয়া লও। *

মৃত্যু অমৃতের সোপান

* * ভগবানের সৃষ্টি অতীব বিচিত্র! এক যখন অনন্ত হইলেন অনন্তরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলেন, তখন সব রূপে সব ভাবে তাঁহার অনন্ত না হইলে কি চলে? রূপের ভিতর দিয়া তিনি অনন্ত, গুণের ভিতর দিয়া তিনি অনন্ত,—ভাবের ভিতর দিয়া তিনি অনন্ত। দুইটি জীব দুইটি পাতা দুইটি বালুকা-কণা, এমন কি দুইটি পরমাণুও সব বিষয়ে সব ভাবে একরূপ বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে তো আর অনন্ত-দেবের অনন্তত্ব বজায় থাকেনা। যেদিকে চাই অনন্তই অনন্ত! সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখ, তোমার মন অনন্তে ডুবিয়া গিয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়িবে। আকাশের দিকে গ্রহ-উপগ্রহের দিকে চাহিয়া দেখ, অনন্তদেবের মহান ভাব তোমাকে পাগল করিয়া দিবে। এদিকে ফুলটির দিকে ফলটির দিকে ছেলেটির দিকে মেয়েটির দিকে তাকাইয়া দেখ, তোমার মন অনন্ত ভাবসাগরে হাবুডুবু খাইতে আরম্ভ করিবে। এক-একটি বালুকাকণা একবিন্দু জল একটি

পরমাণুর তত্ত্ব অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়া দেখ, অণুর ভিতরে অনন্তদেবের বিচিত্র খেলা বিচিত্র সৃষ্টি-কৌশল বিচিত্র লীলা-মাধুরী তোমাকে অবাক করিয়া দিবে! স্থূল সূক্ষ্ম কারণ বা ব্যষ্টি ও সমষ্টি জগতের যেদিকে যাও সে দিকেই অনন্তদেবের অনন্ত লীলা-রহস্য তোমাকে অস্থির করিয়া অবাক করিয়া সমাধিমগ্ন শান্ত করিয়া দিবে। সর্ব্বত্রই বিচিত্র। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কে তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিবে? তিনি খেলা করিবেন, কে তাঁহার খেলার তাল ভঙ্গ করিবে? জগতের সর্ব্বত্রই বিচিত্রতা—প্রত্যেক জীব প্রত্যেক পরমাণু যেন এক-একটি অদ্ভুত অলৌকিক কাজ করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে; সেই কাজের মধ্য দিয়া অনন্ত পরিণতি লাভ করিয়া তাহার যেন পূর্ণত্বপ্রাপ্তি না হইলে পূর্ণস্বরূপের পূজা না করিলে পূর্ণস্বরূপের লীলার সহায় না হইলে চলেনা। যে যে-কাজ করিতে আসিয়াছে, তাহার জন্য যেন সে দায়ী; সে কাজে তাহাকে সাহায্য করিতে তাহার প্রকৃতি যেন সর্ব্বদা তৎপর, উহাতে পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারিলেই যেন তাহার জীবন সার্থক হইয়া যাইবে—ভগবৎ-ইচ্ছা পূর্ণ সফলতা লাভ করিবে। ইহার জন্য সে এত ব্যস্ত যে অন্য দিকে অন্যের কাজের দিকে নিজের আরামের দিকে, এমন কি আপন শরীরের দিকেও যেন তাহার ভ্রূক্ষেপ করি-

বার অবকাশ জুটিয়া উঠেনা। গঙ্গাজল পাহাড় হইতে সাগর উদ্দেশে গিয়া সাগরে মিলিয়া তাহার জীবন সার্থক করিবে, তাই সে পাহাড়পর্ব্বত বনঅরণ্য ভেদ করিয়া আজ এমন-ভাবে উধাও হইয়া চলিয়াছে যে রাস্তার কোন কিছুর দিকে তাহার লক্ষ্যই নাই! জমি তাহার কতটা জল শুকাইয়া লইল কত জায়গায় তাহার জল কত ভাবে বিভক্ত হইয়া কত ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিল, সে সব কথা তাহার আজ ভাবিতে গেলে চলিবে না; সে চলিয়াছে তাহার প্রিয়তমের অভিসারে—কবে কি উপায়ে সে তাহার প্রেমাস্পদের দেখা পাইবে প্রাণারামের সঙ্গে মিলিয়া আত্মনিবেদন করিয়া জীবন সার্থক করিবে, সে ভাবনাও যেন তাহার মনে স্থান পায় নাই। এজন্য হাজার হাজার বিপদকে অগ্রাহ্য করিতে দুঃখকষ্ট বাধাবিপত্তির তীব্রতাকে অস্বীকার করিতে, এমন কি মৃত্যুকেও অবলীলায় তুচ্ছ করিতে বিন্দুমাত্রও সে তখন ইতস্ততঃ করেনা। প্রিয়তমের সহিত মিলনের জন্য প্রিয়তমের সেবার জন্য প্রিয়তমের তৃপ্তিসাধনের জন্য যে বিপদ যে অসুবিধা যে কষ্ট, তাহা যে পরম সম্পদ পরম অবলম্বনীয় পরমানন্দের নিদানভূত বলিয়া মনে হয়। যে অজ্ঞানী যে অপ্রেমিক যে স্বার্থপর যে দেহ-গেহাদিকে সার পদার্থ বলিয়া মনে করিয়াছে, সে-ই অসুবিধাকে বাধা-বিপত্তিকে দুঃখকষ্টকে মৃত্যুযন্ত্রণাকে মৃত্যুকে ভয় করিয়া

থাকে। প্রেমিক বলেন "তব দত্ত বিষ বিষ কে কহে, পর-দত্ত সুধা তুলনা তো নহে। যদি কর শিরে আঘাত অসি, পিছু না হটিব রহিব বসি। তব তরে আমি সহি যে দুখ, দুখ নহে সেতো বিমল সুখ। তব তরে যদি মরণ হয়, বেঁচে উঠা সেতো মরণ নয়।"

ঐ যে মাধবী-লতা আমগাছটিকে এমন মধুর ভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছে, ওকি আর তোমার আমার কথায় সহজে তাহার প্রাণের সহকারকে ছাড়িয়া দিবে? উহার ডালপালা কাটিয়া দাও উহার গায় আগুন লাগাইয়া দাও, এমন কি উহার মূলও কাটিয়া দাও তবু যে ও উহার প্রেমাস্পদকে ছাড়িয়া জীবন ধারণ করিতে প্রস্তুত নহে। বরং তখন উহার শুষ্ক লতাদেহ যেন আরও জোরের সহিত তাহার প্রাণের সহচরকে জড়াইয়া ধরিবে। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উহাকে জানিতে হইবে যে, কেহ প্রেমিককে প্রেমাস্পদের বাহুবন্ধন হইতে ছিন্ন করিতে সক্ষম নহে। যে অপ্রেমিক সে-ই মৃত্যুকে ভয় করে। প্রেমিক-পতঙ্গ যে তাহার প্রেমাস্পদের সহিত মিলিবার জন্য মৃত্যুঅগ্নির মধ্য দিয়া গিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া প্রেমের অমৃতত্ব ঘোষণা করে। এই যে মা ভগবতীর জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ মা '—' তাহার প্রিয়তম পুত্রের জন্য এক বৎসর যাবৎ আহার-নিদ্রা সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কামনাবাসনা বিসর্জ্জন দিয়া দিন-রাত্রি

তাহার প্রাণের '—'র সেবায় নিরত রহিয়াছে, ইহার স্বার্থত্যাগ ইহার বৈরাগ্য ইহার সাধনা যে মহা তপস্বীর তপস্যাকেও হীনপ্রভ করিয়া দিতেছে। এ মা যদি নিজের প্রাণের বিনিময়ে তাহার প্রিয়তম সন্তানের প্রাণটি ফিরিয়া পায়, তবে সে যে বহুবার জীবন বিসর্জ্জন করাকেও আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিয়া নিজের জীবন ধন্য মনে করিবে। ঐ যে যুবতী '—' আপন স্বামীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া সব রকমের কঠোরতা সাধনা ও উপাসনার সাহায্যেও প্রিয়তমের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা না দেখিয়া আনন্দের সহিত নিজ হাতে অক্ষয় আলতা ও সিন্দুর পরিয়া স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার আশায় স্বামীর শয্যার পাশে শয়ন করিয়া ইচ্ছামৃত্যু লাভ করিল, ইহার ভিতর দিয়া সে কি মৃত্যুকে অবহেলায় তুচ্ছ করিয়া আনন্দে বরণ করিয়া দেবাদিদেবের ন্যায় মৃত্যুঞ্জয়-আখ্যা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য নহে? এইজাতীয় মা এইজাতীয় স্ত্রী জগৎকে শিক্ষা দিয়া থাকেন কি করিয়া দুঃখ-কষ্ট মৃত্যু-যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যুকেও মানুষ অগ্রাহ্য করিতে আনন্দের সহিত বরণ করিতে পারে। কাপুরুষ অজ্ঞানী অপ্রেমিকের নিকট মৃত্যু ভীষণ হইলেও বীর সাধক প্রেমিকের নিকট যে উহা অতি কোমল মধুর ও আরামপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই। তার পরে ঐ যে যোদ্ধা স্বদেশ স্বজাতি ও

স্বধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অম্লানবদনে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে বসিয়াছেন, ঐ যে অস্ত্রে দেহ ক্ষতবিক্ষত হইলেও সেদিকে উহাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই, ঐ যে বাম হস্ত ছেদিত হইলেও উহাঁর উৎসাহ বিন্দুমাত্রও না কমিয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, ঐ যে জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে জয়ের সূচনা দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া গেলেন, ইনি যে দুঃখকে বিপদকে মৃত্যুকে স্বীকার করিতে ভয় করিতে কোন মতেই প্রস্তুত ছিলেন না, মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতের আনন্দ-ভোগে চির সমাধি-মগ্ন হইয়া গিয়াছেন তাহাতে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ঐ যে সেদিন ফিলিপ সিড্‌নি জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে পিপাসায় অস্থির হইয়াও জলের গ্লাসটি অন্য পিপাসী সৈন্যের মুখে তুলিয়া দিয়া আত্ম-প্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, উহাঁকে জিজ্ঞাসা কর বুঝিতে পারিবে অমৃতলাভের জন্য মৃত্যু কত বরণীয় রমণীয় গ্রহণীয় ও স্পৃহণীয়, প্রকৃত বীর পুরুষ কি ভাবে মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতের দেশে চলিয়া যায়। যাঁহারা জীব-সেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, নিজের জীবন দিয়া বিপন্নের পীড়িতের জীবন রক্ষা করিবার সুযোগ পাইলে জীবন সার্থক মনে করেন, তাহাদের সুখশান্তির জন্য নিজের সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিয়া জীবন সফল করিতে তৎপর, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর দুঃখ কি করিয়া সুখের কারণ হয় মৃত্যু কি

করিয়া আনন্দের সহায় হয়। সামান্য জীবের মধ্যেও এই ভাবে দুঃখকষ্টকে তুচ্ছ করিতে মৃত্যুকে আনন্দের সহিত বরণ করিতে দেখা গিয়া থাকে। বরিশালের ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর বিট্‌সন বেলের একটি কুকুর কি ভাবে তাহার প্রভুকে ভীষণ সর্পের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, তাহা আমরা ছাত্রাবস্থায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কুকুর কি ভাবে আপন প্রভুর সুখ শান্তি আনন্দের জন্য নিজের সুখ শান্তি আনন্দ বিসর্জ্জন করে, প্রভুর জীবনরক্ষার জন্য নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়া অপার আনন্দ অতুল তৃপ্তি অনুভব করে তাহার দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ নহে। ঘরে আগুন লাগিলে মা সন্তানের, স্বামী স্ত্রীর, স্ত্রী পীড়িত স্বামীর জীবনরক্ষার জন্য কি ভাবে যে জীবন উৎসর্গ করিতে ব্যস্ত হয়, শত দুঃখ-কষ্টকে আনন্দের কারণ মনে করে, আমরা তাহারও বহু পরিচয় পাইয়াছি। ধাত্রী পান্না কি ভাবে রাজকুমারের জীবনরক্ষার জন্য আপন সন্তানের জীবন আহুতি দিয়া নিজের জীবন সার্থক মনে করিয়াছিলেন তাহাও আমরা আজ পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি নাই। ইহাঁদের প্রত্যেকে শুধু কথায় নয়—কাজে জীবন দিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়া শিখাইয়া গিয়াছেন, সংযতের বীরের জ্ঞানীর সাধকের প্রেমিকের নিকট মৃত্যু কি ভাবে আপন উগ্রমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া অসি-

মুণ্ড দূরে ফেলিয়া মনোহর বরাভয় গ্রহণ করিয়া সন্তানের দুঃখ দূর করিতে তৎপর হইয়া পড়ে।

জ্ঞানী জ্ঞানের গবেষণা নিয়া কি ভাবে তন্ময় হইয়া সুখ দুঃখের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান, তাহাও আমাদের নয়ন-গোচর হইয়াছে। পুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যুসংবাদও যে তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই, তাহাও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কত বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে গিয়া ভাবী তত্ত্বাবিষ্কারের উজ্জ্বল আলোক প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের শ্রম সফল হওয়ার আশায় অম্লানবদনে দুঃখকষ্টকে বরণ করিয়া নিজের মৃত্যুতে অবিচলিত থাকিয়া কত ভাবে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। মেরুপ্রদেশ আবিষ্কার করিবার জন্য কত লোক কত কষ্ট সহ্য করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় সেই মেরুপ্রদেশ আবিষ্কারের জন্য উধাও হইয়া ছুটিয়াছেন ; ইহাঁরা মৃত্যুকে গ্রাহ্য করেন মৃত্যুকে ভয় করেন, একথা মনে ভাবাও যে মহাপাপ! হাওয়ার জাহাজ নিয়াও তো কত লোক মারা গেলেন, অথচ কত লোক মরিতে প্রস্তুত হইয়া জগতের কল্যাণের সহায় হইতে বদ্ধপরিকর হইতেছেন। ইহাঁরা বাহিরের উন্নতি জীবের কল্যাণসাধনের আশায় যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে সক্ষম তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মের জন্য সত্যের

জন্য যে কত লোক কত ভাবে কত কষ্ট আনন্দের সহিত সহ্য করিয়াছেন, কি ভাবে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন, সকল দেশের ইতিহাস যে ইহার দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। এইভাবের স্বার্থত্যাগের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ইতিহাসকে বরণীয় লোভনীয় রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। শক্তিপূজায় বাস্তবিকই যে বলিদানের প্রয়োজন হয়! তবে অধুনা সে বলিদানের অপব্যবহারে অনেক সমাজ যে কলুষিত হইতে বসিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বার্থ বিসর্জ্জন না করিয়া সুখ বিসর্জ্জন না করিয়া আত্মবলি না দিয়া জগতে কোন্ দিন কোন্ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে? সমুদ্রের নিকট নদীর নিকট বহু জীবকে বলি দিয়া আজ আমরা নদীর উপর সমুদ্রের উপর এতটা আধিপত্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। হাওয়ার নিকট এতগুলি জীব আত্মবলি দিয়া আজ হাওয়ার জাহাজ এতটা উন্নত অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছে। রসায়নের মন্দিরে বিজ্ঞানের মন্দিরে এতগুলি সাধকপণ্ডিতের আনন্দের সহিত আত্মবলিদানের ফলে বিজ্ঞান-শাস্ত্র আজ এতটা উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছে। রাজনীতির বর্ত্তমান পরিণতির জন্য যে কত কত উন্নত স্বদেশপ্রেমিক জীব-হিতে রত বীরপুরুষকে অম্লানবদনে আনন্দের সহিত দেশমাতার মন্দিরে আত্মবলি দিতে হইয়াছে, কে তাহার

ইয়ত্তা করিতে পারে? সত্যের জন্য ধর্ম্মের জন্য কত ঋষিমুনি কত সাধকপণ্ডিত যে কত ভাবে সুখ শান্তি আরামকে, এমন কি এত প্রিয় জীবনকেও হাসিতে হাসিতে বলি দিয়াছেন, জাতীয় ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী। যীশুর বলিদান বাস্তবিকই শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। স্বার্থ অহংকার ও নিজ সুখস্পৃহাকে বলি না দিতে পারিলে বাস্তবিক মা আদ্যাশক্তি তৃপ্ত হন না, আমাদের ভিতরে আমাদের দেশের ভিতরে সমস্ত জীবের ভিতরে শক্তির বিকাশ একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। বলি দিতে পারেন বীরপুরুষ বীরাচারী সাধক; বলি দিতে পারে মুক্তি-প্রিয় স্বাধীন জাতি; বলিদান করিতে জানেন জ্ঞানী ভক্ত প্রেমিক; বলি দিতে পারেন মহম্মদের মত বিশ্বাসী, যীশুর মত প্রেমিক, রাণা প্রতাপের মত বীর, কর্ণের মত দাতা, বুদ্ধের মত সংযমী, দধীচির মত ঋষি, চৈতন্যের মত প্রেমিক, নিত্যানন্দের মত অক্রোধ পরমানন্দ, হরিদাসের মত জীবের হিতকামী। ইহাঁরা সকলেই দুঃখকষ্টকে সুখের কল্যাণের ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় জানিয়া মৃত্যুকে অমৃত-ধামের সরণি মনে করিয়া এত আনন্দের সহিত বরণ করিয়া নিজেরা অমর হইয়া অমৃতধামের রাস্তা প্রশস্ততর কল্যাণতর মধুরতর করিয়া গিয়াছেন। বিহুলার মা কি ভাবে বিহুলাকে

যুদ্ধের সাজে সাজাইয়া দিয়াছিল তাহা স্মরণ কর, বাদলের মা বীরপুত্র বাদলের মৃত্যুতে কি ভাবে জীবন সার্থক মনে করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে চেষ্টা কর। সতী সাধ্বী রমণী কি ভাবে যুদ্ধ হইতে পলাতক স্বামীকে ভৎ'সনা করিয়া উত্তেজিত করিয়া বীর-মদে মাতাইয়া পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া মৃত স্বামীর সহিত সহমরণ যাইবার সম্ভাবনায় আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন, জীবনকে সার্থক মনে করিয়া মরণতত্ত্বকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, ধ্যানযোগে তাহা হৃদয়াঙ্গম করিতে চেষ্টা কর।

······যে জাতি যত সংযত যত স্বাধীনতাপ্রিয় যত মুক্ত সে জাতি দুঃখকষ্টকে মৃত্যুযন্ত্রণাকে তত কম ভয় করে। রুশ-জাপানের যুদ্ধে দেখা গিয়াছে জাপান মৃত্যুকে কিরূপ অগ্রাহ্য করিতে শিখিয়াছে। স্থূলদৃষ্টিতে যাঁহারা মুক্ত তাঁহারাই যখন মৃত্যুভয়ে অস্থির হন না, তখন যাঁহারা সর্ব্বভাবে মুক্ত তাঁহারা যে মৃত্যুকে অবহেলা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? ভারতের সুদিনে মুক্তি কি জিনিস সুখ-দুঃখ জন্মমৃত্যুতে কি ভাবে উদাসীন থাকিতে হয় থাকা যায়, তাহাও ভারত উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বেশ সুন্দর ভাবে দেখাইয়া গিয়াছেন। যার জীবনের লক্ষ্য ঠিক হইয়া গিয়াছে, যে আত্মভাবে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে, সে আর রোগে শোকে মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হইবে কেন? যে জাতি

যত পরাধীন যে জাতি যত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, সে জাতিই যে মৃত্যুকে তত ভয় করিয়া থাকে। হায়, পতিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত স্বরূপবিস্মৃত কাপুরুষ ভারতবাসী! তুমি আর কি করিয়া বীরের মৃত্যুতত্ত্ব সাধকের স্বার্থত্যাগ-রহস্য আজ অনুভব করিবে। যে ভারতবাসী রোগে শোকে অনাহারে দুঃখকষ্টে লক্ষ লক্ষ লোককে আস্তে আস্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়াও বিচলিত হয় না, আর দশের জন্য দেশের জন্য ধর্ম্মের জন্য মুষ্টিমেয় বীরসাধকের মৃত্যুসংবাদে ভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে দেশের ভবিষ্যৎ আশা লোপপ্রায় মনে করিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির হইয়া যায়, সে আর কি করিয়া মৃত্যুতত্ত্ব মৃত্যুর মহিমা বুঝিতে সক্ষম হইবে? ভাল কাজ করিতে গিয়া ছেলেটা হঠাৎ মরিয়া গেল—একটু দেখিতে পাইলাম না একটু সেবা করিতে পারিলাম না, কে আমাকে বৃদ্ধবয়সে পালন করিবে? কে আমার সুখদুঃখের সহায় হইবে? ইহা অপেক্ষা দুই-তিন বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভোগাইয়া মারা গেলেও যে শেষ সময় বাছার মুখখানি দেখিয়া শোক দূর করিতাম, এ ভাবনা যে মায়ের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় সে মা যে দিনরাত জপতপে রত থাকিলেও স্থূলদর্শী স্বার্থপর ভগবৎপ্রেমাস্বাদনে অসমর্থা তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। অজ্ঞানী বুঝিতে পারিবে না, পাপী কষ্টভোগ করিবে, মূর্খ পদে পদে প্রতারিত হইবে, অসাধক

ভগবৎপ্রেম আস্বাদনে বঞ্চিত থাকিবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। যে দেহকেই সার তত্ত্ব বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছে, আত্মার দেহাতীত অস্তিত্বে আত্মার নিত্যত্বে যে শ্রদ্ধাহীন, দেহের সুখদুঃখকে যে সার পদার্থ বলিয়া মনে করিয়া বসিয়াছে, দেহের নাশকেই যে সর্ব্বনাশ মনে করে ; সে যে দুঃখের আঘাতে অধীর হইয়া পড়িবে, মৃত্যুভয়ে হতাশ হইয়া যাইবে, আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতে কাঁদিয়া অস্থির হইবে, কাঁদাইয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাপুরুষের যে অনেকবার মরিতে হয়। পলে পলে সে মৃত্যুযাতনা মৃত্যুজনিত বিয়োগজনিত দুঃখকষ্ট ভোগ করে। নিজের ও অপর সকলের সুস্থাবস্থায়ও সে একটা অসার কাল্পনিক মৃত্যুভীতি তৈয়ার করিয়া তাহার তাপে তাহার দাপে তাহার ভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে। প্রকৃত মৃত্যু যতটা কষ্টদায়ক মৃত্যু-ভাবনা মৃত্যুভয় যে তদপেক্ষা কোটিগুণ কষ্টের কারণ হইয়া পড়ে। ছেলে সুস্থ সবল সুন্দর-দেহে কোলে শয়ন করিয়া আছে ; তখনও মা ভাবিতে বসিলেন ছেলের যদি অসুখ হয়, অসুখ যদি ভাল না হয়, অসুখে যদি ছেলে মারা যায় তবে আমার কি অবস্থা হইবে! ভাবিতে ভাবিতে মা কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, ছেলের ঘুম ভাঙ্গিল ছেলে মার কান্নায় যোগ দিল। মা ভয়ে ভয়ে থামিয়া

গেলেন, কিন্তু ছেলের কান্না চলিতে লাগিল—বলতো কি বিড়ম্বনা কি পাপের ভোগ! ইহাদের দুঃখ দূর করা যে বিধির পক্ষেও অসম্ভব হইয়া পড়ে!

মানুষ অতীত ও ভবিষ্যৎ লইয়াই যে ভাবে ব্যস্ত তাহাতে বর্ত্তমানের সুখশান্তি ভোগ করা তাহার পক্ষে যে একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। দুঃখকে ভয় করিয়া দুঃখের স্বরূপ না বুঝিয়া দুঃখকে বাড়াইয়া তুলিয়া আমরা যে আরও ভীষণ করিয়া তুলি। রোগ যতটা কষ্টদায়ক রোগের ভয় রোগের ভাবনা রোগ নিয়া ব্যস্ত থাকা রোগের কথা সকলকে বলা যে তাহা অপেক্ষা কষ্টকর। একজন সামান্য জ্বরে অস্থির হয়, আর একজন প্রবল ব্যাধিকেও বিশেষভাবে তুচ্ছ করে অগ্রাহ্য করে যন্ত্রণায় সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে; এখন বলতো ব্যাধি কাহার উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম? একজন কাপুরুষ অলস মৃত্যুভাবনা নিয়া সদাই বিষণ্ণ, মৃত্যুচিন্তায় অস্থির, কাহারও মৃত্যুতে একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে; আর একজন বীরপুরুষ দেশের কাজে জগতের উন্নতি-বিধানে সকলের আনন্দবৃদ্ধির চিন্তায় এত মগ্ন যে মৃত্যু-সম্বন্ধে কোনও কথা ভাবিবার তাহার অবকাশ নাই, অসুখ হইলেও সেদিকে মন দিতে সে অভ্যস্ত নহে, সময়ও পায় না। আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুতেও সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, নিজের মৃত্যুসময়ও তাহার জীবনের আদর্শটির দিকে এত স্থির-

দৃষ্টি যে মৃত্যুযন্ত্রণা তাহার উপর বিন্দুমাত্রও আধিপত্য-বিস্তারে সক্ষম হয় না, মৃত্যুসময় তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিয়া সে আনন্দসমাধিতে বিভোর হইয়া পড়ে। বলতো এই দুইজনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কাহার জীবন অনুকরণীয়? যাহার জীবন অনুকরণীয় তাহার আদর্শে জীবন-গঠনে বদ্ধপরিকর না হইলে শুধু দুইখানা বই পড়িয়া শুধু দুইটি কথা শুনিয়া তোমার প্রাণের যাতনা স্থায়ীভাবে দূর হইবার নহে। ভগবান জ্ঞানী সাধকভক্তের দুঃখ দূর করিতে সক্ষম। যে বোঝে তাহাকে বুঝান যায়, যে কিছুতেই বুঝিবে না—যে বুঝিয়াও বুঝিবে না, যে বুঝিয়াও তদনুসারে কাজ করিবে না, তাহার কষ্ট দূর করা অসম্ভব। যে অজ্ঞানী ভীরু কাপুরুষ অলস সে মৃত্যুর স্বরূপ কিছুতেই বুঝিবে না, মৃত্যু সম্বন্ধে কতকগুলি অসার কল্পনাজল্পনা লইয়া ভয়ে অস্থির হইয়া পড়িবে, সে আত্মার নিত্য সর্ব্বগত-তত্ত্ব অবগত না হইয়া দেহকেই সার পদার্থ মনে করিয়া দেহে আমিত্ব স্থাপন করিয়া দেহের নাশকে সর্ব্বনাশ মনে করিয়া মৃত্যুভয়ে অধীর হইবে; কোনও মহৎ কাজে লিপ্ত না থাকায় কোনও মহৎ কাজে জীবন উৎসর্গের সুযোগ না পাওয়ায় দৈহিক দুঃখকষ্টের দিকে সমস্ত মনপ্রাণকে নিয়োজিত রাখায় ভাবনা-চিন্তা দ্বারা দুঃখকে বাড়াইয়া তুলিয়া কল্পিত কষ্টে ও রোগযাতনায় বিচলিত হইয়া পড়িবে।

আর যে জ্ঞানী যে বীর যে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ যে আত্মোন্নতিতে জগতের কল্যাণে ভগবৎপ্রীতিসম্পাদনে উৎসর্গীকৃত-জীবন, সে মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া আত্মার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া দেহকে ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রবিশেষ মনে করিয়া জন্মমৃত্যুকে ভগবৎলীলার সহায়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, অসুখকে সুখের প্রকাশকরূপে মৃত্যুকে অমৃতের সরণিরূপে গ্রহণ করিয়া মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত দশের কাজে দেশের কাজে ভগবৎসেবায় এমন ভাবে তন্ময় হইয়া যাইবে, তাহার অভাবে তাহার বন্ধুগণ তাহার সেবকগণ কিভাবে তাহার অবলম্বিত কাজ সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে তাহার আলোচনায় তাহার উপদেশে সে এতটা বিভোর থাকিবে, যে তখন তাহার মনে মৃত্যু-যন্ত্রণা মৃত্যু-চিন্তা কোনরূপে প্রবেশলাভে সক্ষম হইবে না। জ্ঞানী সাধক বীরপুরুষ প্রেমিক ভগবৎভক্ত কিভাবে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে দুঃখকষ্টে মৃত্যুযন্ত্রণায় অবিচালিত থাকে, তাহার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদি মৃত্যুতত্ত্ব বুঝিতে ইচ্ছা থাকে জ্ঞানের অনুশীলন কর, আত্মা কি সূক্ষ্মদেহ কি স্থূলদেহ কি, স্থূলদেহ কেন আসে কেন যায়, এই আসাযাওয়ার ভিতর দিয়া আত্মার দেহীর কি কল্যাণ সাধিত হয়, সে তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা কর। সৃষ্টি ও লয়তত্ত্ব, ইহাদের আবশ্যকতা ইহাদের স্বরূপ ইহাদের লীলাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সচেষ্ট

হও। মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য কি সারতত্ত্ব কি, কিভাবে তাহা জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া উত্থানপতনের মধ্য দিয়া সুখদুঃখের ভিতর দিয়া সাধিত হইতেছে, ভাবিয়া দেখ। এই জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টিলয় যাঁহার খেলা লীলা স্বভাব, তাঁহার স্বরূপটি সগুণ-নির্গুণ তত্ত্বটি ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। সৃষ্টি ও লয় কেন 'আনন্দপ্রাচুর্য্যাৎ' কেন আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত সাধনা আরম্ভ করে। তুমি যে দেহ নও—আত্মা, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরমাত্মার অংশ বা শক্তি, এই কথা স্মরণ করিয়া স্মরণ রাখিয়া ভগবৎলীলার সহায়ভাবে যে কাজের জন্য প্রেরিত হইয়াছ সেই কাজে কায়মনোবাক্যে লাগিয়া যাও—অন্য সব কামনা বাসনা আসক্তি একেবারে ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে একাগ্র হও। 'তচ্চিন্তনং তৎকথনং অন্যোন্যং তৎপ্রবোধনং এতদেকপরত্বং' না হইলে যে তত্ত্বসাক্ষাৎ করা যায় না স্বরূপদর্শন করা যায় না। জন্ম-মৃত্যু যে ব্রহ্মসাগরের ঢেউ, সেই সাগরের প্রকৃত তত্ত্ব তাহার শান্তভাব ও উঠানামার তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা কর, ভগবান সহায় হইবেন ; আশা করি একদিন জন্মমৃত্যুর লীলারহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জন্মমৃত্যুকে জয় করিয়া অমৃত-তত্ত্ব আস্বাদের অধিকার লাভ করিবে।

ওঁতৎসৎ

বিবৃতি

১৬ পৃষ্ঠা—'স্বাভাবিক কর্ম্মজ্ঞান'—জগতের ব্যবহারিক সত্তার জ্ঞান (experimental knowledge) যাহা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ হইতে উৎপন্ন, তাহা ভগবানকে প্রকাশ করিবার জন্য সৃষ্ট হইলেও ব্যবহারিক জীবের পক্ষে উহা যেন ভগবানকে আচ্ছাদন করিয়াই রাখিয়াছে; আত্মার যে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ তাহার প্রকাশে বাধা দিতেছে। ব্যবহারিক জগতে ইহা একটা জীবন্ত ভাব জীবনের লক্ষণ হইলেও আধ্যাত্মিক জগতে সাধকদের নিকটে ইহা আধ্যাত্মিক মৃত্যু-বিশেষ। এই ব্যবহারিক ভাবের উপরে গিয়া পরমাত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া আমাদিগকে এই আধ্যাত্মিক মৃত্যুকে জয় করিতে হইবে। জ্ঞানীর নিকট যাহা দিন অজ্ঞানীর নিকট তাহা রাত্রি, জ্ঞানীর নিকট যাহা মৃত্যু অজ্ঞানীর নিকট তাহাই জীবন। অজ্ঞানী যাহা লইয়া ভুলিয়া থাকেন আনন্দ করেন, জ্ঞানী তাহার অসারতা উপলব্ধি করিয়া তাহাকে দুঃখের কারণ মনে করিয়া প্রকৃত আনন্দের অনুসন্ধানে ধাবিত হন। সাধকদের সাধনার শেষ অবস্থায় ব্যবহারিক সমস্ত জ্ঞান-কর্ম্মগুলিও অসার-বোধে ত্যাজ্য হইয়া পড়ে। আত্মার রাজ্যে এ সবও যে চঞ্চল মরণ-ধর্ম্মাত্মক।

১৭ পৃষ্ঠা—'অধ্যাস'—আরোপ, ভ্রমবশে এক বস্তুকে অন্য বস্তু মনে করা; যেমন রজ্জুতে সর্পের আরোপ নিবন্ধন উহাতে সর্পভ্রান্তি।

২৭ পৃষ্ঠা—'কারণ-শরীর'—স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অতীত অবিদ্যারূপী শরীর-বীজ।

,, ,, —'তুরীয় ভাব'—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার অতীত চতুর্থ অবস্থা।

৩৩ পৃষ্ঠা—'মহৎ, অহঙ্কার'—সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের দ্বিতীয় তৃতীয় তত্ত্ব।

,, ,, —'পঞ্চতন্মাত্রা'—স্থূল ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ মরুৎ ব্যোমের মূলীভূত সূক্ষ্ম রূপ।

১৬৯ পৃষ্ঠা—'বলরামের মায়াদেখা'—ইহা একটী রূপক কাহিনী। জীব কামনার বশে ব্রহ্ম-মায়ায় আবৃত হইয়া সংসারে আসক্ত হইয়া স্বরূপ ভুলিয়া যায়; এই তত্ত্ব গল্পে বুঝান হইয়াছে। কৃষ্ণ-বলরাম দুই ভাই, বেশ আনন্দেই আছেন; কিন্তু বলরামের একদিন ইচ্ছা হইল কৃষ্ণের মায়া দেখিবেন। দুই ভাই যমুনায় স্নান করিতে চলিয়াছেন; মা বলিয়াছেন 'রান্না প্রস্তুত, শীঘ্র আসিবে'। বলরাম কৃষ্ণকে বারবার অনুরোধ করিতেছেন মায়া দেখাইতে। কৃষ্ণ প্রথমে অস্বীকৃত হইলেও শেষে বলরামের অতিরিক্ত আগ্রহে মায়া দেখাইতে সম্মত হইয়া বলিলেন 'দাদা, দুইটী কথা মনে রাখিতে হইবে; তুমি যে স্বইচ্ছায় মায়া দেখিতে যাইতেছ তাহা ভুলিবে না এবং আমি যে তোমার ভাই একথাও সর্ব্বদা মনে রাখিবে'। যমুনায় নামিয়া স্নান আরম্ভ হইল। ইত্যবসরে এক বৃহৎ হস্তী আসিয়া বলরামকে পৃষ্ঠদেশে তুলিয়া লইয়া পলাইল এক রাজার রাজ্যে। সেখানকার রাজার মৃত্যু হইয়াছিল।

বলরামকে সেই রাজ্যের রাজা করা হইল। অভিষেক হইল, বিবাহ হইল, পুত্রকন্যা হইল; পত্নী ও পুত্রকন্যা লইয়া বলরামের সুখে দিন কাটিতে লাগিল। পূর্ব্বকথা আর কিছুই মনে রহিল না। কিন্তু এই সুখ বেশী দিন রহিল না। পুত্রশোকে ও পরে পত্নীবিয়োগে বলরাম অধীর। পত্নীর চিতায় ঝাঁপ দিতে চাহিতেছেন, সহমৃত হইবেন—কারও মানা শুনিতেছেন না, এত শোকে বিহ্বল! এমন সময়ে কৃষ্ণ আসিয়া বলিলেন 'দাদা ভাত যে ঠাণ্ডা হ'ল, মা ভাবছেন'। বলরাম কৃষ্ণের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন 'কে তোমার দাদা?' কৃষ্ণ একটু স্পর্শ করিতেই বলরামের চৈতন্য হইল। কৃষ্ণ বলিলেন 'দাদা এত ভুল! একটি কথাও মনে নাই!' বলরাম দেখিলেন সেই যমুনার পাড়ে, গামছা দিয়া গা-মোছা অর্দ্ধসমাপ্ত!

আমাদের অবস্থাও এই রকম। মায়ার সংসার দেখিতে আসিয়া নিজকে ভুলিয়া ভগবানকে ভুলিয়া দুঃখ পাই, শেষে ভগবানকেই দোষ দিই।